# বিদ্যার্থী বিবেকানন্দ

"জাগ্রত কাশ্মীর," "ডঃ কোটনীশ" ও "কংগ্রেস মেডিক্যাল মিশন"
প্রভৃতি গ্রন্থপ্রণেতা এবং সাংবাদিক

**শ্রীদুর্গাপদ তরফদার**

প্রণীত

আসাম বুক ডিপো

কলিকাতা—৯

প্রকাশক
শ্রীঅরুণচন্দ্র গুহ
২১, পটুয়াটোলা লেন
কলিকাতা—৯

দ্বিতীয় সংস্করণ, ১৯৬২

মুদ্রাকর
শ্রীজগদীশ দাশ
শ্রীগুরু আর্ট প্রেস
১৬, নলিন সরকার ষ্ট্রীট
কলিকাতা-৪

# ভূমিকা

স্বামী বিবেকানন্দের জন্ম-শতবার্ষিকী উপলক্ষে আমাদের ছেলে-মেয়েদের জন্যই এই বইটির সূচনা। স্বামীজীর ছেলেবেলার কাহিনী জানবার জন্য তাদের কত আগ্রহ রয়েছে! কিন্তু বড়দের জন্য লেখা বই তাদের কিশোর-মনের আগ্রহ মেটায় না। তারা ভয়ে ভয়ে ওগুলোকে দূরে রেখে চলে। তাদের স্বাভাবিক আগ্রহ হ'লো তাদের মতন -বয়সে স্বামীজী কী করতেন, তিনি কী ভাবতেন এবং কী ভাবে নানা ঘটনার ভেতর দিয়ে তিনি বড় হয়েছেন তাই জানা। তিনিও ত' তাদেরই মতন শিশু থেকে বিশ্ববিখ্যাত হয়েছেন। এই পুরুষসিংহের জীবনের সেই সব কথা তাদের কিশোর-মনে যত আনন্দ দেবে, উৎসাহ দেবে তেমন আর কিছুই হতে পারে না। আবার স্বামীজীর বিরাট জীবনের সব কিছু নির্যাস ক'রে ছেলেদের কাছে পরিবেশন ক'রলে সব সময় তা ওরা নিতে পারে না। কারণ বয়সের অনুপাতেই গ্রহণ করবার ক্ষমতা ধীরে ধীরে বাড়ে। তাই শৈশব থেকে আরম্ভ ক'রে ঠাকুর শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণের পদছায়ায় আসা পর্যন্ত বীরেশ্বরের অর্থাৎ নরেন্দ্রনাথের শৈশবকালের ও ছাত্রজীবনের নানা কাহিনী ছেলেমেয়েদের জন্য সংগ্রহ করেছি। যে সকল সূত্র থেকে এগুলি সংগ্রহ করা হয়েছে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তার উল্লেখ রয়েছে। তাদের সকলের কাছেই আমার কৃতজ্ঞতা স্বীকার করছি।

বর্তমানের অস্বাভাবিক অবস্থার দরুণ বইটির ছাপার কাজে নানাভাবে বিলম্ব হয়েছে। তাই যেমনটি ক'রে বইটি প্রকাশ করবার ইচ্ছা রয়েছে বর্তমান সংস্করণে তা পূর্ণ করা গেল না। পরবর্তী সংস্করণে সে অভাব দূর করবার চেষ্টা করবো।

সোদর-প্রতিম শ্রীযুক্ত অরুণচন্দ্র গুহ মশায়ের আগ্রহেই এই বইটির প্রকাশ সম্ভব হয়েছে। মামুলী ধন্যবাদ দিয়ে তাকে ছোট করবো না। বইটির অঙ্গসজ্জার জন্য শিল্পী শ্রীঅরুণ গুপ্ত ও প্রচ্ছদপটের জন্য শিল্পী শ্রীঅমূল্য দাস এবং অনুলিপির কাজের জন্য স্নেহভাজন শ্রীমান্ সৌমেন্দ্রকুমার গোস্বামীকেও আমার আন্তরিক শুভেচ্ছা জানাচ্ছি। ইতি

শ্রীদুর্গাপদ তরফদার

# উৎসর্গ

মদীয় আচার্যদেব
স্বামী অখণ্ডানন্দ মহারাজের
পুণ্য স্মৃতির উদ্দেশ্যে।

# সুচীপত্র


| বিষয় | | | পৃষ্ঠা |
|---|---|---|---|
| **এক** | | | |
| ভোরের স্বপ্ন | .... | .... | ১ |
| দত্ত পরিবারের আদি কথা | .... | .... | ৩ |
| হাতে খড়ি | .... | ... | ১৫ |
| বালক বিরেশ্বরের বুদ্ধদেব দর্শন | .... | .... | ২২ |
| বীরেশ্বরের বীরত্ব | .... | ... | ২৯ |
| বিদ্যালয়ে বীরেশ্বর | .... | ... | ৩৭ |
| খেলাধূলা গান-বাজনায় বীরেশ্বর | ... | ... | ৫৮ |
| বিদ্যালয়ের শেষ পর্ব | .... | .... | ৭৯ |
| পাগলা বিলে | .... | .... | ৮৮ |
| **দুই** | | | |
| যুবক নরেন্দ্রনাথ | ... | .... | ১০২ |

# বিদ্যার্থী বিবেকানন্দ

## এক

### ভোরের স্বপ্ন

স্বপ্ন দেখলেন ভুবনেশ্বরী দেবী। স্বয়ং কাশী বিশ্বনাথ চারদিক আলো ক'রে এসে দাঁড়িয়েছেন তাঁর সামনে। দেবতা বললেন, "তোর কাতর প্রার্থনায় আমি আর থাকতে পারলুম না। তাই এসেছি তোকে বর দিতে। বল তুই কি চাস্?"

ভুবনেশ্বরী দেবী বললেন, "বাবা, আমার বংশে বাতি দিতে যে কেউ নেই। তুমি যদি একবার দয়া করে মুখ তুলে চাও।"

শিব আশুতোষ—অল্পতেই তুষ্ট। হেসে বললেন, "তথাস্তু।"

ধীরে ধীরে অপূর্ব আলোর জ্যোতি চারিদিকে ছড়িয়ে পড়লো। মহাদেবের বিরাট মূর্তি মিলিয়ে গেল এক সুন্দর শিশুর মধ্যে। সেই সৌম্য-দর্শন শিশু তার কচি কচি দু'খানা হাত বাড়িয়ে ঝাঁপিয়ে পড়লো ভুবনেশ্বরী দেবীর বুকের মাঝে।

ঘুম ভেঙ্গে গেল।—

ভুবনেশ্বরী দেবী জেগে উঠে অন্ধকার ঘরে দু'হাত মেলে বিছানার ভিতর খুঁজতে লাগলেন! কোথায় গেল সেই দেবতার দান—স্বর্গের শিশু, যে ঝাঁপিয়ে পড়লো তাঁর বুকের ওপর!

স্বপ্নের ঘোর কেটে গেল। এবার তিনি বুঝতে পারলেন যে এতক্ষণ তিনি স্বপ্ন দেখছিলেন। তবে এ-কি শুধু স্বপ্ন? না, তাঁর এত দিনের পূজো সত্যিই সার্থক হ'লো!........দেবতা কি তবে সত্যই মুখ তুলে চাইলেন! মহা আনন্দে ভুবনেশ্বরী দেবী কেঁদে ফেললেন। তাড়াতাড়ি স্বামীকে ডাকলেন। বললেন, তাঁর এই স্বপ্ন-দর্শনের অলৌকিক কাহিনী।

ভুবনেশ্বরী দেবীর স্বামী বিশ্বনাথ দত্ত সব কথা শুনে আনন্দে বললেন, "কাউকে যেন একথা ব'লো না। দেবতা আমাদের কাতর প্রার্থনা শুনেছেন। এ তাঁর বর।" ততক্ষণে উষার আলো পূব

আকাশে দেখা দিয়েছে। মহাদেবের উদ্দেশ্যে সূর্যদেবের চরণে দুজনে প্রণাম জানালেন।



লোকে বলে ভোরের স্বপ্ন নাকি সত্যি হয়……

# দত্ত পরিবারের আদি কথা

আগে কলকাতার চেহারায় এখনকার মত জাঁক-জকম ছিল না। গঙ্গার ধারে ছিল কয়েকটি ছোট গ্রাম মাত্র—গরীব লোকের বাস। গ্রামগুলির নাম ছিল সূতানুটী, কালিকোতা ও গোবিন্দপুর। বিদেশী ব্যবসায়ীদের কুঠি ছিল তখন হুগলী শহরে। মোগল বাদশাহদের সৈন্যও ঐখানেই থাকতো। তখন ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর প্রতিনিধি ছিলেন জব চার্ণক। তাঁর সঙ্গে মোগল বাংলার ফৌজদারের ঝগড়া হয়। তিনি তাকে তাড়িয়ে দেন হুগলী থেকে। সে প্রায় ১৬৯০ সালের কথা। বেগতিক দেখে চার্ণক নৌকো ক'রে রাতারাতি গঙ্গা ধ'রে পালিয়ে এসে সূতানুটী ও কালিকোতা গ্রামে আশ্রয় নেয়। এই গ্রামগুলিতে তখন ছিল খুব গরীব লোকের বাস, যেমন এখনও অন্যান্য পাড়াগাঁয়ে থাকে। এখনকার বাগবাজার থেকে বড়বাজার-ডালহৌসী অঞ্চল অবধি লোক এই সব পাড়াগাঁয়ের হাঁটাপথে যাতায়াত করতো। তারপর এখনকার এসপ্লানেড-চৌরঙ্গী এলেকা থেকে স্বরু করে গড়ের মাঠ ও আলিপুরের ব্রীজ, এই সব জায়গা ছিল গভীর জঙ্গল। এখনকার চৌরঙ্গীর জাঁক-জমক জৌলুস তখন কোথায়! গভীর নলচে-বনের মধ্যে তখন দক্ষিণ রায় বাঘের বাসা আর সাপের অড্ডা। ঠগী-ডাকাতদেরও ঘাঁটি ছিল ঐ জঙ্গলে। শোনা যায় চৌরঙ্গী বাবা বলে একজন সাধু ঐ বনের মধ্যে এক মন্দিরে বাস করতেন। তখন কালিঘাটের তীর্থে যেতে হ'লে দল বেঁধে এই চৌরঙ্গী বাবার আখড়া হ'য়ে যেতে হ'তো। দল বেঁধে না গেলে হয় বাঘের পেটে না হয় ঠগী-ডাকাতদের হাতে প্রাণ দিতে হ'তো।

যাক, জব চার্ণক সূতানুটী গ্রামেই আশ্রয় নিল। ওখানে একটা ব্যবসায়ের কুঠিও ধীরে ধীরে সে তৈরী করে। পরে এখন যেখানে ডালহৌসী স্কোয়ার হ'য়েছে সেখানকার কালিকোতা গ্রামে এসে গঙ্গার ধারে কুঠি উঠিয়ে নিয়ে এলো। সে হ'লো ১৭০০ খৃষ্টাব্দ। অর্থাৎ আজ থেকে মাত্র ২৬৬ বৎসর আগের কথা। ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী ১৭১৭ খৃষ্টাব্দে আরও অনেকগুলি গ্রাম ইজারা নিয়ে ব্যবসা বাড়িয়ে ফেলে। এইভাবে বেলেঘাটা, বেলগাছিয়া, বেহালা এইসব গ্রামগুলি এদের ইজারায় এসে যায়।

বাংলার নবাব আলিবর্দি খাঁ তখন মারা গেছেন। সিরাজদ্দৌল্লা বাংলার নবীন নবাব হয়েছেন। যুবক নবাব দেখলেন যে ইংরেজ কুঠিয়ালদের মতিগতি মোটেই সুবিধের নয়। তারা ব্যবসার উপলক্ষ্যে এদেশের শাসন-ক্ষমতা দখল করবার ষড়যন্ত্র করছে। আর নবাবের আদেশ পদে পদে অমান্য করছে। নবাব তাই ইংরেজ কুঠিয়ালদের সুযোগ না দিয়ে ১৭৫৬ খৃষ্টাব্দে কোম্পানীর ঘাঁটি কালিকোতা গ্রামের কুঠি আক্রমণ করলেন। চতুর ইংরেজ কুঠিয়াল মার খেয়ে বশ্যতা স্বীকার করলো। কিন্তু সুযোগের অপেক্ষায় রইলো। পরের বৎসরই ১৭৫৭ খৃষ্টাব্দে ইংরেজ কুঠিয়াল নবাবের রাজধানী মুর্শিদাবাদ আক্রমণ করে। ক্লাইভ হ'লেন তার পাণ্ডা। পলাশীর মাঠে যে যুদ্ধ-হয় তাতে জয়লাভ করলো চতুর ইংরেজ। নবাব সিরাজদ্দৌল্লা হেরে গেলেন। বাংলা স্বাধীনতা হারালো।

ইংরেজ কুঠিয়াল বুঝলো যে এখন এদেশে শক্ত হয়ে বসবার সময় এসেছে। তাই তাদের সৈন্য-সামন্ত রাখবার ঘাঁটি আগে যে জায়গায় তৈরী করেছিল সেখান থেকে সরিয়ে নিয়ে যাওয়া ঠিক করলো। পুরোণো কেল্লা ছিল এখনকার ডালহৌসী অঞ্চলে। প্রথমে কোম্পানীর লোক এই কেল্লা তৈরী করেছিল নবাবকে না জানিয়ে চুপি চুপি। তারপর ১৬৭০ খৃষ্টাব্দে ফোর্টের নামকরণ হলো

ফোর্ট উইলিয়ম। এখনও ডালহৌসী স্কোয়ার অঞ্চল খুঁড়লে মাটির নীচে পুরোণো কামান বা যুদ্ধের সরঞ্জাম পাওয়া যাচ্ছে। কোম্পানীর কুঠিয়ালগণ ঠিক করলো যে এখনকার এসপ্ল্যানেড থেকে সুরু করে গঙ্গার ধার পর্যন্ত যে বিরাট জঙ্গল রয়েছে তা কেটে সাফ ক'রে দেওয়া হ'বে, আর একদম গঙ্গার উপরেই একটা বড় দুর্গ বা ফোর্ট তৈরী করবে। তাই এখানকার গোবিন্দপুর গ্রাম কোম্পানী সরকার দখল করলো। যে সব লোকজন ঐ অঞ্চলে বাস করতো তাদের নামমাত্র ক্ষতিপূরণ দিয়ে উঠিয়ে দেওয়া হ'লো। এসব ঘটনা পর পর ঘটে যায় ইংরেজরা সিরাজদ্দৌল্লাকে ১৭৫৭ খৃষ্টাব্দে হারিয়ে দেবার পর থেকে। পুরোণো কেল্লার তারা নাম দিয়েছিল ফোর্ট উইলিয়ম। নতুন ফোর্ট তৈরী হ'লো ১৭৭৩ খৃন্টাব্দে, কিন্তু নাম একই রইলো। আর নতুন ফোর্ট উইলিয়মে পাকাপাকি ভাবে সৈন্য-সামন্ত থাকতে আরম্ভ করলো প্রায় ১৮০০ খৃষ্টাব্দে। অর্থাৎ এখন থেকে মাত্র ১৬৬ বৎসর আগে।

গঙ্গার ধারে দিনমণি সূর্য উঠছেন আবার অস্তাচলে যাচ্ছেন গঙ্গার স্রোতের মতোই। দেশী রাজা গেলো বিদেশী রাজা এলো। দেশের মানুষ স্বাধীনতা হারালো। বাংলা দেশে নতুন যুগ আরম্ভ হ'লো —এই যুগের ঢেউ দত্ত পরিবারকে গোবিন্দপুর গ্রাম থেকে উত্তর "কালিকোতা" গ্রামের সিমুলিয়া পাড়ায় এনে হাজির করলো।

বিশ্বনাথ দত্ত ছিলেন সেকালের কলকাতার একজন নাম করা এ্যাটর্ণী (আইন ব্যবসায়ী)। তাঁদের আদি বাড়ী ছিল বর্দ্ধমান জেলার কালনা মহকুমার "দত্ত-দেরেটোন" গ্রামে। শোনা যায় দত্ত বংশের যশ ও নামের জন্যেই "দেরেটোন" গ্রামের নামও "দত্ত-দেরেটোন" বলে সকলে বলতো। এই গ্রাম এখন অম্বিকা-কালনা রেল স্টেশন হ'তে মাত্র তিন মাইল দূরে।

এই গ্রাম থেকেই বিশ্বনাথ দত্তের আদি পুরুষ রামনিধি দত্ত কলকাতায় এসে বাড়ী করেন গোবিন্দপুর গ্রামে। এখন যেখানে কলকাতার ফোর্ট উইলিয়ম হয়েছে ঐ জায়গাটাকেই তখন গোবিন্দপুর বলা হ'তো।

ইংরেজ সৈন্যদের জন্য যখন ওখানে কেল্লা তৈরী করবার ব্যবস্থা হ'লো তখন রামনিধি দত্ত উত্তর কলকাতার সিমুলিয়া পল্লীতে উঠে আসলেন মাত্র ১৮ টাকা ক্ষতিপূরণ নিয়ে।

রামনিধি দত্তের বড় ছেলে রামজীবন। তার ছেলে রামমোহন দত্ত। রামমোহন দত্ত ছিলেন তখনকার দিনে সুপ্রীম কোর্টের একজন ফার্সী উকিল। তিনিই সিমলা পল্লীতে গৌরমোহন মুখার্জী লেনের চৌ-মহলা বাড়ী তৈরী করেন। তার আগে তাদের বাড়ী ছিল মধু রায়ের গলিতে। সে বাড়ীর আর কোন চিহ্ন এখন নেই। এই রামমোহন দত্তেরই বড় ছেলে হ'লেন দুর্গাপ্রসাদ দত্ত এবং ছোট ছেলে হ'লেন কালীপ্রসাদ দত্ত। দুর্গাপ্রসাদ সংস্কৃত ও ফার্সী ভাষায় পণ্ডিত ছিলেন। দুর্গাপ্রসাদ তখনকার দিনে ভারত সরকারের দেওয়ান রাজীবলোচন ঘোষের কন্যা শ্যামাসুন্দরীকে বিয়ে করেছিলেন। শ্যামাসুন্দরী এক দিকে যেমন পরমা সুন্দরী অপর দিকে ছিলেন তেমনি বুদ্ধিমতী। শোনা যায় শ্যামাসুন্দরী পয়ার ছন্দে গঙ্গা-বন্দনার একখানি সুন্দর বাংলা কবিতার বইও লিখেছিলেন। প্রথমে তাঁর একটি মেয়ে ও পরে একটি ছেলে হ'বার পরই তার স্বামী দুর্গাপ্রসাদ দত্ত মাত্র ২৫।২৬ বৎসর বয়সে গৃহত্যাগ করে সন্ন্যাসী হ'য়ে কাশী চলে যান।

দুর্গাপ্রসাদ দত্তের এই ছেলেই হ'লেন বিশ্বনাথ দত্ত—যিনি বীরেশ্বর বা স্বামী বিবেকানন্দের বাবা। তাঁর জন্ম হয় ১৮৩৫ খৃষ্টাব্দে অর্থাৎ তিনি ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের (১৮৩৬—৮৬) এক বৎসরের বড়। শোনা যায় যে দুর্গাপ্রসাদ দত্ত সন্ন্যাসী হ'য়ে যাবার পর একবার

গঙ্গাসাগর মেলায় সাগর-স্নান করবার জন্য এদেশে আসেন। তাঁর ভাই কালীপ্রসাদ দত্ত খবর পেয়ে তাঁকে জোর ক'রে ধ'রে কলকাতার বাড়ীতে এনে আটক ক'রে রাখেন। কিন্তু তিনি বন্দী অবস্থায় খাওয়া-দাওয়া সব ছেড়ে দেন। এই অবস্থা দেখে দুর্গাপ্রসাদকে আর কেউ ধ'রে রাখতে চাইলেন না। ভগবানের জন্য যাঁর মন সত্যিই কাঁদে তাঁর কাছে ঘর-সংসার টাকা-কড়ি মিথ্যা মায়ার বাঁধন ব'লেই মনে হয়। দুর্গাপ্রসাদ ঘর ছেড়ে নিরুদ্দেশ হ'লেন। তাঁর স্ত্রী শ্যামাসুন্দরী দেবী ছেলেটিকে নিয়ে দেবর কালীপ্রসাদের সঙ্গে রইলেন। কালীপ্রসাদ চাকুরী করতেন না। তিনি সম্পত্তির আয়ের ওপরই চলতেন। তাই সংসার ভাঙ্গতে সুরু করে।

বিশ্বনাথ দত্তের ছেলেবেলায় তাই বড় কেউ তাকে দেখ্‌বার শোন্‌বার ছিল না। পাড়ার লোকেরা এটা বড় ভাল চোখে দেখ্‌লেন না। কালীপ্রসাদ দত্তকে কথা শোনাতে লাগলেন। শেষ পর্যন্ত বিশ্বনাথকে ওরিয়েণ্টাল সেমিনারী বিদ্যালয়ে ভর্তি ক'রে দেওয়া হ'লো। কিন্তু স্কুলে তাকে খালি-পায়ে হেঁটেই যাওয়া-আসা করতে হ'তো। পয়সার অভাব। এক দিন মাষ্টার মশায় তাকে জিজ্ঞেস করলেন—"খোকা তোমার জুতো কোথায় ?"

"বাবা কাশী রয়েছেন; সেখান থেকে ফিরে এলে, তিনি কিনে দেবেন।"—বিশ্বনাথ উত্তর দিলো।

দুঃখকষ্টের মধ্যেই বিশ্বনাথের লেখাপড়া চলতে থাকে; এবং শেষ পর্যন্ত বি. এ. পাশ ক'রে ব্যবসায়ে ঢুকলেন উপার্জনের জন্য। কিন্তু ভাগ্যে তার লেখা আছে অন্য বিধান। বিশ্বনাথ দত্তের মা শ্যামাসুন্দরী পুত্রকে বলতেন, "বাবা, তোমার রক্তে রয়েছে ত্যাগ—তুমি কি কখনো ব্যবসা করতে পারবে! তুমি সৎপথে অর্থ উপার্জনের চেষ্টা কর।" শেষ পর্যন্ত ১৮৬৬ খৃষ্টাব্দে বিশ্বনাথ দত্ত এ্যাটর্নী

পরীক্ষা দিয়ে পাশ ক'রে আইন ব্যবসা আরম্ভ করলেন। বিশ্বনাথ দত্ত আপন-ভোলা এবং সৎ-প্রকৃতির লোক ছিলেন। তিনি ব্যবসায়ে উন্নতি ক'রে টাকা-পয়সা বেশ আনতে লাগলেন। কিন্তু সংসারে কি হয় না হয় বড় একটা খবর রাখতেন না। তার কাকা কালীপ্রসাদ দত্ত কুটিল প্রকৃতির লোক ছিলেন, তেমনি তাঁর স্ত্রীও ছিলেন কুটিল স্বভাবের। তার ফলে বিশ্বনাথের বিষয়-সম্পত্তির নানারূপ ক্ষতি হ'লেও তিনি জীবনের শেষদিন পর্যন্ত খুড়ো মশায়কে কখনো অসম্মান করেন নাই।

বিশ্বনাথ দত্ত এমন উদার স্বভাবের ছিলেন যে, তিনি যখন আপন দাদুর ( দেওয়ান রাজাবলোচন ঘোষ ) সম্পত্তি পেলেন—তখন ইচ্ছে করলেই তা তিনি নিজের জন্য রাখতে পারতেন। কিন্তু তিনি তা না ক'রে পরিবারের সকলের জন্য এবং খুড়ো মশাইকে পর্যন্ত লিখে দিলেন। বিশ্বনাথ দত্তকে একজন একাজ করতে বারণ করলে তিনি উত্তর করলেন, "দেখ, আমাকে এই খুড়ো মশাই শৈশবে অন্ন দিয়ে বাঁচিয়েছেন। তাঁর জন্য আমি সব দান করতে পারি।"

মাত্র ষোল বৎসর বয়সের সময় বিশ্বনাথ দত্ত সিমুলিয়ার নন্দলাল বসুর একমাত্র কন্যা ভুবনেশ্বরী দেবীকে বিয়ে করেন। তারপর থেকে ধীরে ধীরে তার উন্নতি হ'তে থাকে। কিন্তু স্বামী-স্ত্রী কারো মনেই কোন শান্তি নেই। কলকাতায় সিমলা পাড়ায় তখন তাঁদের মস্ত বড় বাড়ী, গাড়ী-ঘোড়া কত কি—! ধন-জন, আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু-বান্ধব কোন কিছুরই তাঁদের অভাব নেই, কিন্তু এত সত্ত্বেও মনে সুখ-শান্তি নেই। তাঁদের সংসার সবকিছুতেই ভরা হ'লেও তা শূন্য পুরী বলে মনে হ'তো।

কিন্তু কাকে তাদের দুঃখের কথা জানালে এই অভাব দূর হ'তে পারে? বিয়ের পর ভগবান যদিও তাঁদের একটি ছেলে দিয়েছিলেন

কিন্তু জন্মের অল্পদিন পরেই সে মায়া কাটিয়ে চলে গেল। তবে কি বংশে বাতি দিতে কেউ থাকবে না! এই কি ভগবানের ইচ্ছে!

বিশ্বনাথ দত্তের এক দিদি তখন কাশীধামে বাস করতেন। তাঁর কাছে কথায় কথায় দেবী ভুবনেশ্বরী মনের গোপন ব্যথার কথা জানালেন। তিনি বললেন, "দেখ বোন, বাবা বিশ্বনাথকে যদি তুষ্ট করতে পার, তবে তোমার কামনা পূর্ণ হ'তে পারে।"

"কিন্তু কি ক'রে তাঁকে সন্তুষ্ট করা যায়"—ভুবনেশ্বরী দেবী জানতে চাইলেন।

"বাবা ভোলানাথ অল্পেতেই তুষ্ট হন—তা শোননি? শুধু মনের ভক্তি চাই; আর কিছু তিনি চান না—।"

বুড়ি দিদি কাশীধাম থেকে জানালেন যে তিনি প্রতিদিন ৺ বিশ্বনাথ দেবের মন্দিরে যেয়ে তাঁর জন্যে পূজো দেবেন, যাতে তাঁদের একটি পুত্র সন্তান হয়।

বাড়ীতে ভুবনেশ্বরী দেবীও ভোলা মহেশ্বরের কাছে প্রতিদিন প্রার্থনা করেন।

১৮৬৩ খৃষ্টাব্দের ১২ই জানুয়ারী তারিখ বাঙ্গলা ১২৬৯ সালের পৌষ মাসের মকর সংক্রান্তির দিন ভুবনেশ্বরী দেবীর পঞ্চম সন্তানের জন্ম হ'লো। সেদিন তিথি ছিল কৃষ্ণা সপ্তমী। ভোর ৬-৩৩ মিনিটের সময় ব্রাহ্ম মুহূর্তে অর্থাৎ সূর্য উঠবার কিছুক্ষণ আগে এই নবজাতকের জন্ম হয়। তখন পূব-আকাশে ঊষার আলোর আভাসে কলকাতা নগরী জেগে উঠছে। ভক্তপ্রাণ নর-নারী ভগবানের বন্দনায় রত। ঠিক সেই সময় নতুন শিশুর জন্ম দত্ত পরিবারের ইতিহাসে এক পরম শুভক্ষণের সূচনা করলো। সেদিন একথা পরিবারের কেউ বোঝেন নি।

ভুবনেশ্বরী দেবী পেলেন তাঁর দ্বিতীয় পুত্র। প্রথম পুত্রের মৃত্যুর শোক ভুলে গেলেন তিনি। মনে হ'লো তাঁর স্বপ্নের কথা। শিবের

বরে তাঁর এই পুত্র লাভ। তাই দেবতার উদ্দেশ্যে প্রণাম ক'রে তিনি মনে মনে পুত্রের নামকরণ করলেন, 'বীরেশ্বর'। লোকে বলে—'বিলে'।

আতুর ঘরে নতুন বালককে দেখে এক আত্মীয়া তখনই বলেছিলেন —"এযে সন্ন্যাসী দুর্গাপ্রসাদ।"

বীরেশ্বরের জন্ম হয় গৌরমোহন মুখার্জী লেনের বাড়ীতে। এখন এই বাড়ীতে যেতে হ'লে কলকাতার কর্ণওয়ালিশ স্ট্রিটের (বিধান সরণি) বাস বা ট্রামে চড়ে হেদোর পুকুর ধারে বা বেথুন কলেজের সামনে নামতে হয়। সেখান থেকে শ্যামবাজারের দিকে একটু হাঁটতে সুরু করলেই বাঁ দিকে গৌরমোহন মুখার্জীর গলির নাম দেখতে পাবে। সেখানে ঢুকলে একটা পুরোণো বড় বাড়ীর ফটক দেখতে পাবে বাঁদিকে। পুরোণো দত্তবাড়ী ভেঙ্গে চুরে এক্ষণ ঐ অবস্থায় এসেছে। কিন্তু বড় ফটকটা এখনও অতীত ইতিহাসের সাক্ষী হয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে। দেখতে পাবে ঐ বাড়ীর সদর দরজার মাথার উপর শ্বেত পাথরের ফলকে ইংরেজীতে এই কথাগুলি লেখা রয়েছে।

In this house was born on 12th January 1863,
SWAMI VIVEKANANDA
A beloved disciple of
SRI RAMAKRISHNA PARAMAHANSA,
A saint and philosopher of modern India
Who consecrated his life to the service of humanity.

এবার আমরা বীরেশ্বরের অন্যান্য ভাই-বোনদের কথা ব'লে বীরেশ্বরের কথা আবার সুরু করবো।

ভুবনেশ্বরী দেবীর প্রথমে যে ছেলে হয় তার যেমন সুন্দর চেহারা ছিল, সে তেমনি ছিল সুলক্ষণযুক্ত। কিন্তু মাত্র ৮ মাস বয়সে হঠাৎ এই শিশু মারা যায়। তারপর ভুবনেশ্বরী দেবীর হ'লো একটি মেয়ে। কিন্তু মাত্র আড়াই বৎসর বয়সে সে-ও তাদের মায়া কাটিয়ে চলে যায়।

তারপর আবার দুটি মেয়ে হ'লো। তাদের একজনের নাম রাখলেন হারামণি আর একজনের নাম রাখলেন স্বর্ণময়ী। এই চার ভাই-বোনের মধ্যে মাত্র হারামণি ও স্বর্ণময়ীই দীর্ঘজীবী হয়। কিন্তু একটি ছেলে না হওয়ায় বিশ্বনাথ দত্ত ও ভুবনেশ্বরী দেবী দু'জনার মনেই বড় দুঃখ। সেকথা আমরা আগেই বলেছি। দত্ত পরিবারের কাহিনী থেকে জানা যায় যে বিশ্বনাথ দত্তের যে দিদি তখন কাশীবাস করছিলেন, তিনি উপদেশ দেন প্রতি সোমবার দিন যেন ভুবনেশ্বরী দেবী শিবপূজোর ব্রত পালন করেন। এইরূপে একবৎসর ধরে ব্রত পালনের পর জন্ম হোল বীরেশ্বরের বা 'বিলের'।

বীরেশ্বরের পর আরও তিন বোনের জন্ম হয়। তাদের দু'জনের নাম হ'ল কিরণবালা ও যোগেন্দ্রবালা। আর একজনের নাম জানা নেই। এই তিনটি মেয়ের পর ভুবনেশ্বরী দেবীর আবার দুই ছেলে হয়। একজনের নাম মহেন্দ্রনাথ এবং তার ছোটজনের নাম ভূপেন্দ্রনাথ। ভুবনেশ্বরী দেবীর মোট চার ছেলে এবং ছয় মেয়ে হয়। এদের মধ্যে তিন ছেলেই বিখ্যাত। তার মধ্যে বীরেশ্বরই বিশ্ববিখ্যাত স্বামী বিবেকানন্দ।

বীরেশ্বরের ছোট ভাই, মহেন্দ্রনাথের জন্ম হয় ১৮৬৯ খৃষ্টাব্দে। অর্থাৎ মহেন্দ্রনাথ তাঁর দাদার চেয়ে ছয় বৎসরের ছোট। বড় হ'য়ে তিনি লণ্ডনে পড়াশোনা করতে যান। ইয়োরোপ, আফ্রিকা এবং এশিয়ার নানা দেশ নিজের চেষ্টায় ঘুরেও বেড়ান। তিনি এক দিকে যেমন ছিলেন বিরাট পণ্ডিত, আবার তেমনি ছিলেন শ্রীরামকৃষ্ণের পরম ভক্ত। তাঁর লেখা অনেক বই থেকে ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ ও স্বামী বিবেকানন্দের জীবনের নানা কথা জানা যায়। তিনি ঘরে থেকেও সন্ন্যাসীর মত জীবন যাপন করে গেছেন। মাত্র কয়েক বছর আগে তিনি দেহত্যাগ করেছেন।

ভুবনেশ্বরী দেবীর সবচেয়ে ছোট ছেলে হলেন ভূপেন্দ্রনাথ। তিনিও ছিলেন বিরাট পণ্ডিত। ইয়োরোপের জার্মানী, মস্কো প্রভৃতি নানা দেশ এবং আমেরিকা, জাপান প্রভৃতি দেশ তিনি ভ্রমণ করেন। তিনি বাংলাদেশের বিপ্লবী দলে যোগদান ক'রে দেশের সেবায় বিখ্যাত হ'য়ে গেছেন। মাত্র পাঁচ বছর আগে তিনি দেহ ত্যাগ করেন।

ভুবনেশ্বরী দেবীর মেয়েদের মধ্যে যোগেন্দ্রবালা ও কিরণবালা তখনকার দিনে বেথুন গার্লস স্কুলে শিক্ষালাভ করেছিলেন। তারও ছোট বোন সব পড়তেন রামবাগানে পাদরীদের স্কুলে। ছেলেমেয়েদের শিক্ষার জন্য বিশ্বনাথ বাবু খুবই ভাল ব্যবস্থা করেছিলেন।

সেকালের পাঠশালার রীতি ছিল গুরুমশায়কে প্রতি সপ্তাহে তাঁর সকল ছাত্র চাল, ডাল সিধা বা প্রণামী দেবে। আর গুরুমশায়ের কথা না শুনলে বা পড়া না শিখলে ছেলেদের আর রক্ষা থাকতো না। তাই সবাই গুরুমশায়কে যেমন ভয় পেতো আবার তেমনি ভক্তিও করতো।

পৌষ সংক্রান্তির দিন অর্থাৎ বীরেশ্বরের জন্মদিনে বিশ্বনাথ দত্ত প্রতি বৎসর গুরুমশায়কে ও পাঠশালার গরীব ছাত্রদের নতুন কাপড় ও জামা দিতেন। আর গুরুমশায়ও তাঁর ছাত্রদেয় নিয়ে দল বেঁধে, বাজনা বাজিয়ে, নিশান উড়িয়ে গঙ্গায় পূজো দিতে যেতেন। বীরেশ্বরের গানের গলা অতি মিষ্টি আর কবিতাও সে খুব সুন্দর সুর ক'রে পড়তে পারতো। তাই দলের নেতা তাকেই হ'তে হ'তো। গুরু-মশায়ের কথামত ছেলের দল কলকাতার পথে গঙ্গার বন্দনা গাইতে গাইতে মহা আনন্দে গঙ্গাপূজো দিতে যেতো। ছেলেরা বাড়ীতে ফিরে এলেই বীরেশ্বরের বাবা তাদের সকলকে ভরপেট মিষ্টি খাইয়ে দিতেন। তখন সবাই আবার লাইন ক'রে দাঁড়িয়ে সুর ক'রে তাকে গঙ্গাবন্দনা শোনাতো।

"বন্দি মাতা সুরধুনী পুরাণে মহিমা শুনি
পতিত পাবনী পুরাতনী।
বিষ্ণুপদে উপাদান দ্রবময়ী তব নাম
সুরেশ্বর নরের জননী ॥
ব্রহ্মার কমণ্ডুলে বাস আছিলে ব্রহ্মার পাশ
পবিত্র করিয়া ব্রহ্মপুরী।
জীবে দেখি দুরাশয় নাশিবারে ভবভয়
অবনী আইলে সুরেশ্বরী ॥"

দেখতে দেখতে ছয় মাস বাদে বীরেশ্বরের অন্নপ্রাশন হ'লো। ভুবনেশ্বরী দেবী স্বামীকে চুপি চুপি বললেন, "দেখ, শিবের কাছে পূজো দিয়েই এই ছেলে পেয়েছি। তাই ওর নাম আমি রাখবো **বীরেশ্বর**।" বিশ্বনাথ দত্ত আনন্দের সঙ্গে সায় দিয়ে তাঁকে বললেন, "কিন্তু জান, ঠাকুর মশাই গণনা ক'রে মিলিয়ে দেখেছেন তোমার ছেলের রাশি-নাম **নরেন্দ্রনাথ** অর্থাৎ সবার সেরা মানুষ।" ভুবনেশ্বরী দেবী বললেন, "আমি কিন্তু ওকে বীরেশ্বর বলেই ডাকবো।" বিশ্বনাথবাবু হেসে বললেন, "বেশ, তাই হবে।" শেষ পর্যন্ত মুখে মুখে বীরেশ্বর নামটি সবার আদরের 'বিলে' হয়ে দাঁড়ায়।

নতুন ছেলের অন্নপ্রাশনের দিন বিশ্বনাথ দত্ত মশায় বংশের মান রেখেই দরাজ-দিলে খরচ করলেন। ঢুলি বিদায় থেকে আরম্ভ ক'রে দান-ধ্যান ও ভূরি-ভোজন কোন কিছুরই ত্রুটি তিনি রাখলেন না। শোনা যায় যে মনের আনন্দে দান করতে করতে নিজের কাপড়খানি পর্যন্ত নাকি দান করতে গিয়েছিলেন।

দেখা গেল বীরেশ্বর শিশু বয়স থেকেই খুব চঞ্চল প্রকৃতির বালক। এই দুরন্ত বালককে দেখা-শোনার জন্য দুই জন ঝি সব সময়ের জন্য রাখা হ'লো। কারণ কখন সে যে কি ক'রে বসে তার ঠিক নেই। যখন যা জিদ ধরবে তাই তখুনি চাই-ই। মর্জির একটু এদিক-সেদিক হ'লেই আর কথা নেই! রাগের মাথায় ঘরের মধ্যে হাতের কাছে যে জিনিস পাবে, দুরন্ত বালক তাই ভেঙ্গে চুরমার ক'রে দেবে। তখন বাড়ীর চার দিকে "ধর, ধর" রব পরে যেতো। ভুবনেশ্বরীর কিন্তু একটি কৌশল জানা ছিল এই দুরন্ত বালককে শান্ত করবার জন্য; তাহ'লো—"শিব, শিব" বলে মাথায় হাত বুলিয়ে গঙ্গাজল ঢেলে দেওয়া; আর গঙ্গা জল

ঢালতে আরম্ভ ক'রলেই দুরন্ত বীরেশ্বর আশুতোষ শিবের মতই ধীরে ধীরে শান্ত হ'য়ে যেতো। ভুবনেশ্বরী দেবী বলতেন, "পাগলা শিবের পূজো ক'রে শেষে পেলুম কিনা একটা পাগলা ভূত!"

বীরেশ্বরের বড় যে দুই বোন ছিল তাদের সঙ্গে খেলা ক'রতে ক'রতে বীরেশ্বর মাঝে মাঝে রাগ ক'রে বাড়ীর নোংরা নর্দমার মধ্যে নেমে তাদের ডাকতো—'ধর তো দেখি।' তখন আবার ডাক পড়তো মাতা ভুবনেশ্বরীর। তিনি এসে পাগলা শিবের দোহাই দিয়ে তাকে ফিরিয়ে



আনতেন। "শিব, শিব" ব'লে মাথায় গঙ্গাজল ঢেলে বালককে শান্ত করতেন। যদি তাতেও বালক শান্ত না হ'ত তখন ভুবনেশ্বরী দেবী রাগ ক'রে বলতেন, "দেখ্ বিলে, অমনধারা দুষ্টুমী ক'রলে মহাদেব তোকে কৈলাসে ঢুকতে দেবে না।" এই কথা শোনবার পর কি কারণে যেন বীরেশ্বরের সব পাগলামী শান্ত হয়ে আসতো।

# হাতে খড়ি

আজ যেমন পাড়ায় পাড়ায় স্কুল হয়েছে, তখনকার দিনে এত স্কুল-কলেজ ছিল না। আর বিশ্বনাথ বাবুর পাড়ায় যে পাঠশালাটি ছিল সেখানে বীরেশ্বরকে তিনি পাঠাতে চাইলেন না তিনি নিজের বাড়ীর ঠাকুর-দালানেই একটি পাঠশালা বসিয়ে দিলেন। বর্ধমানের এক জন গুরুমশাই বীরেশ্বর এবং পাড়ার অন্যান্য ছেলেদের পড়াবার জন্য ঠিক হ'য়ে গেলেন। পাঠশালা তখনকার দিনে বসতো সকালে ও বিকেলে। সকালের পড়া হ'য়ে গেলে লাইন ক'রে সকলকে দাঁড়াতে হ'তো আর সুর ক'রে নামতা, কড়াকিয়া একসঙ্গে মুখস্থ বলতে হ'তো। নিয়ম ছিল একজন ছাত্র লাইনের আগে দাঁড়িয়ে সুর ক'রে নামতা পড়বে, আর সকলে তা মুখে মুখে একসঙ্গে চীৎকার ক'রে বলবে। এতে শুধু দত্ত বাড়ীই নয়, সমস্ত পাড়াটাই তখন মেতে উঠতো। বিকেল বেলা পড়া শেষ হলে, ছাত্রদের একসঙ্গে সরস্বতীর বন্দনা পাঠ করতে হ'তো—

"উর দেবী সরস্বতী স্তবে কর অনুমতি
বাগিশ্বরী বাক্যবিনোদিনী॥
শ্বেতবর্ণ শ্বেতবাস শ্বেত বীণা শ্বেত হাঁস
শ্বেত সরসিজ নিবাসিনী॥
বেদ বিদ্যা তন্ত্র মন্ত্র বেণু বাণী আদি যন্ত্র
নৃত্য গীত বাদ্যের ঈশ্বরী।
গন্ধর্ব অপ্সরাগণ সেবা করে অনুক্ষণ
ঋষি মুনি কিন্নর কিন্নরী॥
আগমের নানা গ্রন্থ আর যত গুণ পন্থ
চারিবেদ আঠার পুরাণ।
ব্যাস বাল্মীকী-আদি যত কবি সেবে অবিরত
তুমি দেবী প্রকৃতি প্রধান॥

ছত্রিশ রাগিণী মেলে ছয় রাগ সদা খেলে
অনুরাগ যে সব রাগিণী।
সপ্ত স্বর তিন গ্রাম মূর্চ্ছনা একুশ নাম
শ্রুতি কলা সতত সঙ্গিনী॥
তানমান বাদ্য তাল নৃত্য গীত ক্রিয়াকাল
তোমা হ'তে সকল নির্ণয়।
কে আছে ভুবন তিনে তোমার করুণা বিনে
কাহার শকতি কথা কয়॥
তুমি নাহি চাহ যারে সবে মূঢ় বলে তারে
ধিক্ ধিক্ তাহার জীবন।
তোমার করুণা যারে সবে ধন্য বলে তারে
গুণিগণে তাহার গণনা॥
দয়া কর মহামায়া দেহ মোরে পদছায়া
পূর্ণ কর নূতন মঙ্গল॥"

*   *   *   *

গুরুমশায়ের কাছে পাঠের হাতে-খড়ি হলেও বীরেশ্বরের সত্যিকারের হাতে-খড়ি হয় মায়ের কাছে। রামায়ণ-মহাভারতের গল্প ও ছড়া-পড়ার প্রথম পাঠ দেন বীরেশ্বরকে তার মা ভুবনেশ্বরী দেবী। তিনি যেমন সুর ক'রে রামায়ণ পাঁচালী পড়তেন বালক বীরেশ্বরও তারই অনুকরণ ক'রত। শোনা যায় বালক বীরেশ্বরের রামায়ণ পাঠ এত মধুর ছিল যে পাড়ার মধ্যে মাঝে মাঝেই এ-বাড়ী সে-বাড়ীতে তার ডাক পড়তো রামায়ণ পাঠের জন্য।

একদিন বিশ্বনাথ দত্তের কাকা কালীপ্রসাদ দত্ত (বীরেশ্বরের ছোট ঠাকুর্দা) তাকে রামায়ণ পড়তে বললেন। বীরেশ্বরের যারা বড় তারা রামায়ণ পড়তে সুরু করলে তিনি তাদের উচ্চারণ আরু

গলার স্বর শুনে বিরক্ত হয়ে বললেন, "বিলে, তুই সুর করে পড় দেখি।" তখন বীরেশ্বর কৃত্তিবাসের রামায়ণখানি কোলে রেখে একটু নাকি সুরে পয়ার ছন্দে মধুর কণ্ঠে বইখানি পাঠ করতে লাগলো। তা শুনে তিনি ভারী খুসী। বীরেশ্বরকে দু'হাত তুলে বৃদ্ধ কালীপ্রসাদ দত্ত আশীর্বাদ করলেন। মাতা ভুবনেশ্বরীর বুক পুত্রের গৌরবে দশ হাত হয়ে উঠল। বিলে সকলের থেকে ভাল ছেলে!

শোনা যায় এই কালীপ্রসাদ ১৮৬৯ খৃষ্টাব্দে যখন মৃত্যুশয্যায় তখন তিনি বীরেশ্বরকে মহাভারত পড়ে শোনাতে বলেন। যারা বীরেশ্বরকে দেখেছেন তাদের বিবরণ থেকে জানা যায় যে তখন বীরেশ্বরের বয়স মাত্র ৭ বৎসর হবে। বীরেশ্বর সুর ক'রে তার ঠাকুর্দাকে মহাভারত থেকে স্বর্গারোহণ পর্ব পড়ে শোনাতে লাগলো। তার মহাভারত পাঠ শুনে কালীপ্রসাদ দত্ত আশীর্বাদ করেন, "কালে তুই মহৎ হবি।"

বীরেশ্বরের বাবার নানা ভাষা শেখা ও নানা রকমের বই পড়বার ঝোঁক ছিল খুব বেশী। খাওয়া-পড়া বেশ-ভূষা কোনটাতেই বিশ্বনাথ দত্ত মশায়ের নীচু ভাব ছিল না। ছেলেরাও তাই দরাজ দিলের হ'য়ে উঠতে লাগলো। ইংরেজী, বাংলা, উর্দু, ফার্সী ও আরবী সব ভাষাতেই বিশ্বনাথ দত্তের দখল ছিল। বাড়ীর লাইব্রেরীতে বইও ছিল প্রচুর। বীরেশ্বর ছোটবেলা থেকেই ঐ সব সাজানো বইগুলিতে কী আছে, তা জানবার জন্য মা-বাবাকে নানা কথা জিজ্ঞাসা করতো। বড় হ'লে বিশ্বনাথ দত্ত মশায় ছেলেদের ঐসব বই দেখিয়ে বলতেন, "আমাদের সময় হাড়ভাঙ্গা পড়া ছিল। তোদের সময় এখন আর কি?"

বীরেশ্বরের বাবার বৈঠকখানাতে নানা ধর্মের লোক আসতো। সকলকেই বিশ্বনাথ বাবু সম্মান করতেন। তা দেখে দেখে বীরেশ্বরও সকল ধর্মের লোককেই সম্মান করতে শেখে।

বীরেশ্বরের বড় আদরের জিনিস ছিল বাড়ীর বৈঠকখানা ঘরের চারপাশে নানা রকমের পোষা পাখী ও অন্যান্য জীবজন্তু। তার মাকে সে দেখ্‌ত প্রত্যেক দিন অতি যত্নের সাথে ওদের সকলকে খাওয়াতে। বীরেশ্বরও এই সব নতুন খেলার সাথীদের পেয়ে ভারী খুসী। পরবর্তী সময়ে বীরেশ্বর যখন বিবেকানন্দ হয়ে বেলুড়ে মঠ স্থাপন করেছিলেন তখনও তাঁর নিত্য সঙ্গী ছিল ভোলা কুকুরটি।

মাতা ভুবনেশ্বরী দেবীরও আদরের ছিল পোষা পায়রাগুলি। তাছাড়া কাকাতুয়া, বিলাতি ইঁদুর, ময়ূর, বানর, গরু, ছাগল ইত্যাদিও ছিল।

কলকাতায় তখনও ট্রাম বাস চলতে সুরু করেনি। কারণ কলকাতায় প্রথম ঘোড়ার ট্রামগাড়ী চলতে সুরু করে ১৮৭৩ সাল থেকে। আর বাস তো এলো প্রথম মহাযুদ্ধ (১৯১৪-১৮) হয়ে যাবার পর। তার আগে শহরে যাতায়াতের একমাত্র বাহন ছিল বড়লোকদের জন্য জুরিগাড়ী, আর গরীব লোকদের জন্য নিজের পা দু'খানি। বড়লোকদের মেয়েদের যাবার ব্যবস্থা হ'ত পালকী বেহারার কাঁধে। ওদের হাঁক-ডাকে পাড়া সরগরম হয়ে উঠতো।

তাই বালক বীরেশ্বরের সবচেয়ে আকর্ষণের বিষয় ছিল কলকাতার পথ, যে পথ দিয়ে দিনরাত কত রকমের লোকজন, কত রকমের পোশাক-পরিচ্ছদ প'রে কত কি কাজে চলে যাচ্ছে। এদের কথা জানবার জন্য বালক বীরেশ্বর বাড়ীর জুড়ি গাড়ীর কোচোয়ানকেই একমাত্র সহায় বলে ভাবতো। ফাঁক পেলেই বীরেশ্বর কোচোয়ানের কাছে যেয়ে হাজির হ'তো।

"হ্যাঁ, ভাই, আমাকে শহরটা দেখিয়ে আনবে?" কোচোয়ান ঘাড় নেড়ে বলতো, "খুব বিল্লুবাবু—"

বিল্লুবাবুকে পেয়ে কোচোয়ান রূপোর ডাটের ছড়িটাকে নানাভাবে নেড়েচেড়ে কত মজার কথাই না তাকে শোনাত! কোচোয়ান যখন

সোনালী রং-এর সাজ-পোশাক প'রে, হাতের ছড়ি ঘুরিয়ে রাস্তা দিয়ে হাঁক দিয়ে তার গাড়ীটিকে চালিয়ে নিয়ে যেত, তখন বালক বীরেশ্বরের মনে হ'ত এদের মত সুখী লোক আর কে আছে! বালকের এই ভাব পিতাও লক্ষ্য করতেন। তিনি একদিন বীরেশ্বরকে প্রশ্ন করেন, "বড় হয়ে বিলে তুই কি হবি বল দেখি ?"

"সহিস না হয় কোচোয়ান হ'ব"—বালক বীরেশ্বর গম্ভীর ভাবে উত্তর দেয়।

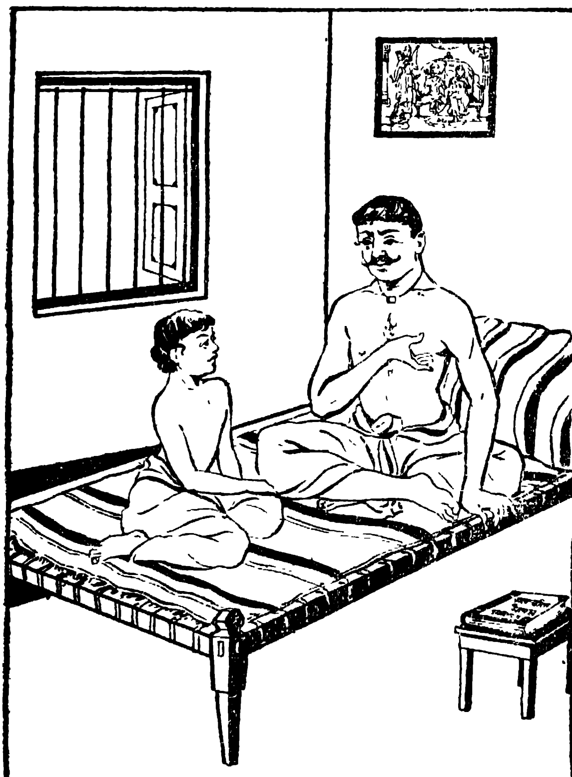
একদিন বীরেশ্বর কোচোয়ানদের আড্ডায় যেয়ে হাজির। তারা বীরেশ্বরকে পেয়ে ভারি খুসী। এখন থেকে মাঝে মাঝেই "বিল্লুবাবু" তাদের ঘরে হানা দেয়। কত প্রশ্ন, কত কথা তার মনে! কোচোয়ানদের ফুরুৎ ফুরুৎ করে তামাক খাওয়াও বীরেশ্বরের কাছে একটা আশ্চর্য ব্যাপার ছিল।

বীরেশ্বরের মনে একদিন একটা গোলমাল বাধিয়ে দিল বুড়ো কোচোয়ান। মাতা ভুবনেশ্বরীর কাছ থেকে বালক বীরেশ্বর শ্রীরামচন্দ্রের গল্প শুনে মনে মনে শ্রীরামচন্দ্র এবং সীতাকেই তার মনের মত দেবতা ঠিক ক'রে ফেলেছে। শ্রীরামচন্দ্র বাবার সত্য রক্ষার জন্য ভরতকে সিংহাসন ছেড়ে দিলেন, চৌদ্দ বৎসর বনবাসে গেলেন এবং প্রজাদের সুখী করবার জন্য নিজের সুখ ত্যাগ ক'রে সীতাকেও পাতালে পাঠালেন। এমন কথা সে আর কোনদিন শোনেনি। এমন মানুষের কথা যতই দেবী ভুবনেশ্বরী বালকের কাছে দিনের পর দিন রামায়ণ থেকে পড়ে শোনাতেন, সে সকল কথা পাথরের মত খোদাই হয়ে বালক বীরেশ্বরের মনে ততই বসে যেতে লাগল। শ্রীরামচন্দ্রই তার আদর্শ পুরুষ।

কিন্তু গোলমাল বাধিয়ে দিলে ঐ বুড়ো কোচোয়ান। সে বীরেশ্বরকে আদর ক'রে "বিল্লুবাবু" বলে ডাকে এবং খুব ভালবেসে

জুড়ি গাড়ীতে করে মাঝে মাঝে তার আদরের বিল্লুবাবুকে কলকাতার পথে পথে ঘুরিয়ে নিয়ে আসে।

বিল্লুবাবু কি খুসী! তা'ছাড়া একটা পনি ঘোড়াও মাঝে মাঝে তার দৌরাত্ম্যে অস্থির হয়। তাকেও সামলাতে হয় ঐ বুড়ো কোচোয়ানকেই।



'রামসীতার গল্প বল না"—বিল্লুবাবু মাঝে মাঝেই বায়না ধ'রে বসে সেই কোচোয়ানের কাছে। সে বলে, "সবচেয়ে গল্প শোনার ভাল সময় দুপুর বেলা। বিল্লুবাবু তখন চলে এসো।"

বিল্লুবাবু লুকিয়ে চলে আসে দুপুর বেলা, গল্প শোনবার জন্য। একদিন গল্প বলার সময় কোচোয়ান বলে, "জান বিল্লুবাবু, রাম দেওতা আছে। কিন্তু তাহ'লে কি হোবে সীতা মাইকে সাদী ক'রে কি দুঃখুটাই না সারা জনম পেলে। সাদী করলেই যত ঝঞ্ঝাট্।"

বেচারা কোচোয়ানের জীবনের দুঃখের কথা রাম-সীতার আদর্শ-জীবনের সঙ্গে মিশে বিল্লুবাবুর মাথায় একটা গোলমাল পাকিয়ে দিল। বিল্লুবাবু মাতা ভুবনেশ্বরীর কাছেই তাই একদিন রাত্রিতে গম্ভীরভাবে জিজ্ঞাসা ক'রল—"হ্যাঁ—মা, বিয়ে করলে লোকের খুব দুঃখ হয়?"

মা ছেলের অদ্ভুত প্রশ্ন শুনে বললেন—"কেনরে বিলে? তোকে কে বললে দুঃখু হয়?"

বালক উত্তর ক'রল—"আমাদের কোচোয়ান বললে, সাদী ক'রে রামচন্দ্রের কত দুঃখ হয়েছিল।—তা'হ'লে রামচন্দ্র কি দেবতা নয়?"

ভুবনেশ্বরী দেবী বালককের অদ্ভুত প্রশ্নে হঠাৎ কি উত্তর দেবেন ভেবে পেলেন না। একটু চিন্তা ক'রে বালককে বোঝালেন যে রামচন্দ্র ইচ্ছে করলেই নিজে সুখী হ'তে পারতেন। কিন্তু তিনি তার বাবা, মা, ভাই এমন কি সৎমাকে সন্তুষ্ট করবার জন্য বনে গেলেন। আবার রাবণের হাত থেকে সীতাকে উদ্ধার করবার জন্য কেমন বীরের মত যুদ্ধ ক'রলেন। রাজসিংহাসন যখন চৌদ্দ বৎসর পর ফিরে পেলেন নিজে মাত্র কয়েক দিনের জন্য রাজা হয়ে পরে লব-কুশকে রাজা ক'রে দিয়ে সিংহাসন ত্যাগ ক'রলেন। রামচন্দ্র সত্যবাদী, রামচন্দ্র বীর, রামচন্দ্র ত্যাগী, আবার রামচন্দ্র আদর্শ ন্যায়পরায়ণ রাজা। এমনটি আর কোন দেশে হয়নি বাবা।"

ভুবনেশ্বরী দেবীর কথায় বালক বীরেশ্বরের মন শান্ত হ'লেও বিয়ে করলে দুঃখ কষ্ট আরও বাড়ে এই ভাবটা তার মন থেকে দূর হ'লো

না। বীরেশ্বর মাকে আবার প্রশ্ন ক'রে—"এমন দেবতা কে আছে যিনি এই দুঃখ-কষ্টের বাইরে ?"

ভুবনেশ্বরী দেবী বালকের সান্ত্বনার জন্য বললেন,—"বাবা, তা'হ'লে তুমি সদানন্দময় শিবকেই পূজো কর।"

আপাততঃ বীরেশ্বরের মন থেকে একটা দুশ্চিন্তার বোঝা নেমে গেল। রামচন্দ্র আবার শিব রূপে দত্ত বাড়ীতে এলেন।

## বালক বীরেশ্বরের বুদ্ধদেব দর্শন

"আমি শিব হয়েছি মা"—বালক বীরেশ্বর কোমরে এক টুকরো গেরুয়া রংয়ের কাপড় জড়িয়ে মার কাছে এসে একদিন হাজির। ভুবনেশ্বরী দেবী বালকের সুঠাম অঙ্গে সন্ন্যাসীর বেশ দেখে মনে মনে শিবকে ভক্তিভরে প্রণাম ক'রে বললেন, "এ তোমার কি লীলা ঠাকুর !"

বীরেশ্বরের এখন বয়স প্রায় ৭ বৎসর। তার এক নতুন খেয়াল হয়েছে কিছু দিন হ'ল। সাধু-সন্ন্যাসী কেউ বাড়ীর কাছ দিয়ে যাচ্ছে দেখতে পেলেই বীরেশ্বর তাকে বাড়ীতে ডেকে আনবে—তাঁর কাছে নানা দেশ ভ্রমণের কাহিনী শুনবে, আর দেব-দেবীর গল্প শুনবে। গল্প শুনে যদি বীরেশ্বর খুসী হ'ত তা'হ'লে তিনি যা চাইতেন তাই দেবার জন্য মাকে পীড়া-পীড়া সুরু করে দিত।

একদিন একজন সন্ন্যাসী বললেন, "তুমি শিবের শুধু গল্প শুনবে কেন ? যদি ইচ্ছে কর তা'হ'লে একলা বসে ধ্যান করলেই শিবের দর্শন পাবে। তিনি বড় দয়ালু দেবতা। অল্পেতেই তুষ্ট হন।"

যে কথা সেই কাজ। বীরেশ্বরের ঠাকুর-ঘরে এসে হাজির হলেন এক শিবমূর্ত্তি। সেই মূর্ত্তির সামনে বসে বীরেশ্বর এখন মাঝে মাঝেই চোখ বুজে চুপ করে ব'সে শিবকে পাবার চিন্তা করে। কথাটা পাড়াপড়শী সকলের জানাজানি হ'ল সেদিন যেদিন তার খেলার

সাথী সকলে এসে দেখে যে বীরেশ্বর আর দু'জন সঙ্গীকে নিয়ে ধ্যানে ডুবে আছে। সঙ্গী দু'টির ধ্যান অনভ্যাসের জন্য এক নিমিষেই ভেঙ্গে গেল। কিন্তু বীরেশ্বর চুপচাপ চোখ বুজে তন্ময় হয়ে আছে। অনেক ডাকাডাকির পর তবে ধ্যান ভাঙ্গে।

আর একদিন আরও একটি ঘটনা সকলকে অবাক করে দিল। সেদিন বীরেশ্বর ধ্যানে বসে আছে অনেকক্ষণ ধ'রে। পাড়ার যে দু'টি সঙ্গী তার সঙ্গে সেদিন ধ্যানে বসেছে তাদের মধ্যে একজনের হঠাৎ ধ্যান ভেঙ্গে চোখ মেলে চাইতেই দেখে যে একটা সাপ ফণা মেলে বীরেশ্বরের সম্মুখে স্থির হয়ে রয়েছে। ভয়ে সে চীৎকার ক'রে উঠলো—"সাপ সাপ।" অপর সঙ্গী এক নিমিষের মধ্যে ঘর থেকে বেড়িয়ে যেয়ে ভুবনেশ্বরী দেবীকে সব কথা জানালো। বীরেশ্বরের মা, বাবা ও অন্যান্য সকলে এসে দেখে এক অবাক কাণ্ড। বীরেশ্বর ধ্যানে নিমগ্ন—কোনরূপ হুঁসই নেই। সামনেই মস্ত একটা সাপ ফণা মেলে দুলছে। তখন সন্ধ্যা হ'য়ে গেছে। জ্যোৎস্না পক্ষের চাঁদ আকাশে উঠেছে। সুন্দর আলো ছড়িয়ে পড়েছে। চারদিক শান্ত—বালক বীরেশ্বরও শান্ত। এক অপূর্ব দৃশ্য! কিছুক্ষণ মধ্যেই সাপটি আপনি কোথায় চলে গেল। ভুবনেশ্বরী দেবীর চীৎকারে বালক বীরেশ্বরের যখন ধ্যান ভাঙ্গলো তখন পাড়ার লোকজন অনেক এসে পড়েছে। বীরেশ্বরকে সাপের কথা ও তার সঙ্গীদের চীৎকারের কথা পরে জিজ্ঞাসা ক'রলে বালক উত্তর ক'রলো, "আমি ওসব কিছুই জানিনে।" ভুবনেশ্বরী দেবীর মনে ভয় হ'ল তবে কি সত্যই স্বয়ং শিবই তাদের ঘরে এসেছেন। বীরেশ্বরও কি তার ঠাকুর্দার মত শেষে সংসার ছেড়ে সন্ন্যাসী হবে!!

বীরেশ্বরের ঠাকুর্দা দুর্গাপ্রসাদ দত্ত তখনকার দিনে সবচেয়ে বড় আদালত সুপ্রীম কোর্টের নাম-করা আইন-ব্যবসায়ী ছিলেন।

তার বাবাও (রামমোহন দত্ত) নাম-করা আইনজীবী ছিলেন দুর্গাপ্রসাদ তাঁর বাবার মতই ছিলেন বুদ্ধিমান। মাত্র ২৪ বৎসর বয়সের মধ্যেই তিনি বেশ নাম-করা উকিল হন। কিন্তু শুধু অর্থ উপার্জনই জীবনের একমাত্র উদ্দেশ্য ব'লে তার মনে হয়নি। তিনি সাধু-সন্ন্যাসীর সঙ্গ এবং ধর্ম-চর্চায় অধিক সময় কাটাতেন। পুত্র বিশ্বনাথের যখন ৬।৭ বৎসর বয়স তখন তিনি একদিন গৃহ ত্যাগ ক'রে সন্ন্যাসী হ'য়ে চলে যান। ১২।১৪ বৎসর পর কয়েক দিনের জন্য কলকাতায় ফিরে এলেও তাঁকে আর ঘরের মায়ায় বাধা গেল না। তিনি আবার গৃহ ত্যাগ ক'রে সাধন-ভজন করবার জন্য চিরদিনের মত চলে যান।

তারপর বহু দিন আর বীরেশ্বরের ঠাকুর্দার কোন সন্ধান কেউ পায়নি। একবার দুর্গাপ্রসাদের পত্নী শ্যামাসুন্দরী পুত্র বিশ্বনাথকে নিয়ে অন্যান্য পরিজনের সঙ্গে কাশীধামে বিশ্বেশ্বর দর্শনের জন্য যান। এক পারিবারিক কাহিনী থেকে জানা যায় যে দুর্গাপ্রসাদের স্ত্রী শ্যামাসুন্দরীর সঙ্গে কাশীধামে দুর্গাপ্রসাদের বড় ভগ্নীও গিয়েছিলেন। বিশ্বনাথ-দর্শনে যাবার সময় কাশীর উঁচু-নীচু পথে চলতে চলতে হোঁচট খেয়ে একজন পড়ে যান। এই দেখে একজন জটাজুটসমন্বিত সন্ন্যাসী ব'লে উঠেন, "গির গিয়া, গির গিয়া"!

সঙ্গী শ্যামাসুন্দরী বহুদিনের পরিচিত কণ্ঠস্বরে চকিতে সাধুর দিকে চোখ ফেরালেন। এ কার কণ্ঠস্বর! স্বামী-স্ত্রীর দেখা হ'ল ক্ষণিকের জন্য। কিন্তু দুর্গাপ্রসাদের বৃদ্ধা ভগ্নীর কোন ভ্রম হ'ল না। তিনি ফিরে দাঁড়িয়ে প্রশ্ন করলেন, "কে ও, দুর্গাপ্রসাদ না?" সাধুটি বিরক্তির সঙ্গে উত্তর করলেন, "তোরা এখানেও জ্বালাতে এসেছিস্?" এই কথা বলেই সাধু দুর্গাপ্রসাদ নিমিষের মধ্যে সেই স্থান পরিত্যাগ ক'রে চলে গেলেন। তাঁর কোন সন্ধান আর পাওয়া গেল না।

সেই দুর্গাপ্রসাদের নাতি বীরেশ্বর। বাবা বিশ্বনাথের বরে তার জন্ম। তবে কি সেও তার ঠাকুর্দার মত সন্ন্যাসী হবে! ভুবনেশ্বরী দেবীর মনেও ভাবনা জাগে। "যা করেন বিশ্বনাথ" বলে দু'হাত তিনি দেবতার উদ্দেশ্যে মাথায় রাখেন।

প্রতিদিন রাত্রিবেলা বীরেশ্বর ও তার অন্য দুই ভাই—মহেন্দ্রনাথ ও ভূপেন্দ্রনাথ এবং বোনেরা মার সঙ্গে ঘুমোবার জন্যে যখন শু'তে যেত তখন গল্প না শুনলে তাদের চলতো না। গল্প শুনতে শুনতে বীরেশ্বর ঘুমিয়ে পড়তো। কোন কোন দিন বীরেশ্বরকেই গল্প বলবার জন্য ভাই-বোনেরা ধ'রে বসতো। এইসব ছোট বেলার গল্প বীরেশ্বর স্বামী বিবেকানন্দ হয়েও ভোলেন নাই। আমেরিকা, ইংলণ্ড প্রভৃতি জায়গায় যখন বক্তৃতা দিতেন তখন তার মধ্যে এই সব ছোটো-বেলার শোনা গল্প তিনি অনেক ব'লতেন। এই গল্পগুলি তাঁর মা বা দিদিমা রামায়ণ, মহাভারত বা পুরাণ থেকে ব'লতেন।

বীরেশ্বরের ছেলেবেলায় শোনা একটা মনের মত গল্প ছিল ব্যঙ্গমা-ব্যঙ্গমীর আত্ম-ত্যাগের কথা। একদিন শীতের রাত্রিতে বনের মধ্যে এক শীতার্ত সাধু এসে একটি গাছের নীচে আশ্রয় নিলেন। সারাদিন খাওয়া হয়নি, সাধু ক্ষুধায় খুবই কাতর। দারুণ শীতে এবং ক্ষুধায় সাধুটি খুবই দুঃখ পাচ্ছে দেখে পাখী দু'টির একটি অপরটিকে বললো, "গৃহস্থের ধর্ম হচ্ছে সাধু-সজ্জনকে সেবা করা। আমরা ওঁর জন্য কি করতে পারি?"

পুরুষ-পাখীটি একটু ভেবে উড়ে এক কামারশালা থেকে এক ডালের একদিক পুড়িয়ে একটু আগুন ক'রে এনে গাছের নীচে ফেলে দিলো আর স্ত্রী-পাখীটি তার উপর আরও অনেক শুকনো পাতা ফেলে আগুন তৈরী ক'রে দিলো। এই আগুনের গরমে সাধুটি হাত-পা গরম ক'রে একটু তাজা হ'য়ে উঠলো।

তখন পুরুষ-পাখী বললো, "সাধুকে এই রাত্রে কি খাবার দেবো ? সন্ন্যাসীরা নিত্য আনে নিত্য খায়। সঞ্চয় করে না।"

তখন তারা একে একে সেই আগুনে ঝাঁপিয়ে প'ড়ে নিজেদের মাংস সাধুর সেবায় দান ক'রে আত্ম-বিসর্জন ক'রল।

সন্ন্যাসী তাদের এই ত্যাগ দেখে অবাক হয়ে ভগবানের কাছে তাদের মুক্তির জন্য প্রার্থনা করতে বসে দেখলেন যে পাখী দু'টি এই অপূর্ব সৎকাজের জন্য দেবলোকে চলে যাচ্ছে।

এইরূপ আরও একটি গল্প তাঁর খুব প্রিয় ছিল। সেটি হ'ল কাগিবগির গল্প। এক সাধু অনেকদিন তপস্যা ক'রতে ক'রতে একদিন ভাবলেন তপস্যার ফলে কি বল তার হয়েছে তা পরীক্ষা ক'রে দেখতে হবে। তার সুযোগও হ'লো। একটা বক সাধুর মাথায় একদিন হঠাৎ মল ত্যাগ ক'রলে সাধু রেগে তার দিকে দৃষ্টি দিতেই সে পুড়ে গেল। সন্ন্যাসী ভাবলেন এখন তবে তার সিদ্ধি লাভ হয়ে গেছে। এই ভেবে তিনি আশ্রম ছেড়ে গৃহস্থের ঘরে ঘরে ভিক্ষা করতে লাগলেন। মনে তার অহংকার আমি সিদ্ধ পুরুষ। এক বাড়ীতে এসে দরজায় হাঁক দিতেই ভেতর থেকে গৃহিণী বললেন, "এখন আমি অসুস্থ স্বামীর সেবায় ব্যস্ত। আপনি দয়া ক'রে অপেক্ষা করুন।" সাধু ভাবলেন গৃহিণী তাঁকে অসম্মান ক'রলো। তাই রেগে বলে উঠলেন, "কী, সাধুর অপমান। তোমায় আমি এখনি ভস্ম ক'রে ফেলতে পারি জান ?"

গৃহিণী উত্তর করলেন, "আমার স্বামীর সেবা হ'লে তবেই আপনাকে ভিক্ষা দিতে পারবো।"

সন্ন্যাসী আবার তাকে ভয় দেখাতেই গৃহিণী তখন বিনয়ের সঙ্গে উত্তর করলেন, "এ আপনার কাগিবগি ভস্ম করা নয়।" সন্ন্যাসী একটু চিন্তিত হ'য়ে বললেন, "তুমি কি ক'রে সে খবর পেলে ?" তিনি উত্তর

ক'রলেন, "নিজের কর্তব্য কাজ ক'রে ভগবানের নিত্য-সেবার ফলে আমি এই শক্তি পেয়েছি। তাতে সব জিনিস বুঝতে পারি ও জানতে পারি।"

সাধু প্রশ্ন ক'রলেন, "তোমার মত এরূপ গৃহী আরও আছে কি ?"

"নিশ্চয়ই আছে"—গৃহিণী উত্তর করলেন। "তা না হ'লে ভগবানের নিয়মের রাজত্ব চলছে কি ক'রে ?" সাধু বললেন, "কেন ?"

গৃহিণী বললেন, "এই সংসারের নানা দুঃখকষ্টের মধ্যেও এরাই তো সত্যের জন্য নীরবে কাজ ক'রে ভগবানের জয় ঘোষণা করে।"

গৃহিণীর কাছ থেকে সন্ধান নিয়ে সাধুটি ঐরূপ আর একজন গৃহীর বাড়ী গেলেন। লোকটি কিন্তু একজন সামান্য ব্যাধ। তখন হাটে মাংস কেনা-বেচা ক'রতে গেছে। সন্ন্যাসী অনেকক্ষণ তার জন্য অপেক্ষা ক'রলেন। তারপর সে ফিরে এলে তাকে আপন পরিচয় দিয়ে তার কাছে উপদেশ প্রার্থনা ক'রলেন। কিন্তু ব্যাধ জানালো যে এখন তার ঘরের যে কাজগুলো রয়েছে সবার আগে তাকে সেইগুলো করতে হবে। তারপর তার বুড়ো মা-বাপ রয়েছেন, তাদের সেবাযত্ন করতে হবে। তারপর বিশ্রাম। সেই সময় তার সঙ্গে আলাপ পরিচয় হবে।

সমস্ত কাজ সেরে ব্যাধ সন্ন্যাসীর সেবাযত্ন ক'রলো এবং তারপর নিজে খেয়ে দেয়ে জানতে চাইলো কেন তিনি তার কাছে এসেছেন ?

সন্ন্যাসী উত্তর ক'রলেন যে, তিনি শুনেছেন যে তিনি পরমধার্মিক। সংসারে থেকেই তিনি সংসারও ক'রছেন আবার ধর্মের কাজও ক'রছেন। কী করে তা করা যায় তিনি সেই উপদেশ শুনতে এসেছেন।

ব্যাধ উত্তর ক'রলো, "দেখুন, সংসারের যা কাজ তা ভগবানের কাজ ব'লেই প্রতিদিন ক'রে যাই। তার বেশী কিছু জানিনে। মা-বাবার সেবাযত্ন ঈশ্বরের সেবা ক'রছি ভেবেই ক'রে থাকি। কারণ

তাঁরাই'ত নিজেদের সবকিছু দিয়ে আমাদের মানুষ করেছেন। এই ভাবে কাজ করাকেই আমি ধর্মের পথে চলা ব'লে মনে করি।"

সাধুটি বুঝতে পারলেন যে যিনি তপস্যার বলে যে দৃষ্টি দিয়ে পাখী পুড়িয়ে মারলেন তা ধর্ম নয়। তিনি সামান্য ব্যাধের কাছে শিক্ষা নিয়ে আবার তপস্যা করতে নির্জন বনে চলে গেলেন।

রাত্রিতে এইসব গল্প শোনার সময় ছোট ভাই-বোনেরা ধীরে ধীরে ঘুমিয়ে পড়তো। কিন্তু বীরেশ্বরের চোখ দু'টি বন্ধ ক'রবার কিছুক্ষণ পরেই এক অদ্ভুত জ্যোতিঃকণা তার দর্শন হ'তো। ঐ জ্যোতিঃ চোখের ভ্রূ দু'টির মধ্যে প্রথমে বীরেশ্বর দেখতো। তারপর ঐ জ্যোতিঃ ধীরে ধীরে তার সমস্ত দেহ ও মনকে ডুবিয়ে দিতো। বালক যেন এক আনন্দের সাগরে ডুবে যেতো।

এই জ্যোতিঃদর্শনের কথা বর্ণনা করতে যেয়ে পরে স্বামী বিবেকানন্দ তাঁর এক প্রিয় শিষ্যকে বলেছিলেন, "মন শুদ্ধ হ'লে, কত Vision ( দিব্য দর্শন ) দেখা যায়।"

এইরূপ দিব্যদর্শন বীরেশ্বরের ছেলেবেলা থেকে সুরু ক'রে স্কুলে পড়বার সময় পর্যন্ত যে মাঝে মাঝেই হ'ত একথা তিনি নিজেই স্বীকার করেছেন।

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ পরে যখন বিবেকানন্দের ছেলেবেলার কথা অন্য লোকের কাছে বলতেন তখন তিনি এই ঘটনার কথা উল্লেখ ক'রে বলতেন, "এটা ধ্যানসিদ্ধের লক্ষণ!"

একদিন বীরেশ্বর একা ঘরে একমনে কী চিন্তায় বিভোর হ'য়ে আছে, এমন সময় হঠাৎ তার মনে হ'লো তার সামনে যেন এসে দাঁড়ালেন এক বিরাট পুরুষ। সেই ব্যক্তির দীর্ঘ আকৃতি, মুণ্ডিত মস্তক, মুখে শান্তির ছায়া এবং দেহের উজ্জ্বল বর্ণের ছটায় সমগ্র ঘরখানি যেন আলোকিত হ'য়ে উঠলো। বীরেশ্বর ভাবে বিভোর হয়ে এই মূর্তিটিকে

দেখতে লাগলো। হঠাৎ মনে হ'লো তিনি যেন কি বলতে চান। বালক ভয় পেয়ে ভাবলো, "কিসের এই মূর্তি? কেন তিনি তারই দিকে এমন করুণার দৃষ্টিতে চেয়ে আছেন? কী তিনি বলতে চান?" কিছু স্থির করতে না পেরে বালক ঘর ছেড়ে চলে যায়। কিছুক্ষণ পরে যখন আবার বীরেশ্বর ঘরে ফিরে এলো, তখন আর সেই মধুর মূর্তির দর্শন পাওয়া গেল না। বীরেশ্বর স্বামী বিবেকানন্দ হ'য়ে এই অপূর্ব দর্শনের কথা প্রায়ই বলতেন। তিনি এই দেবকান্তি মূর্তিকে স্বয়ং বুদ্ধদেব বলেই ভাবতেন।

—০—

## বীরেশ্বরের বীরত্ব

"এই ছোঁড়া তুই শুধু বসে ঘুমুচ্ছিস কেন?"—বীরেশ্বরের গুরুমশাই ধমক দিয়ে উঠলেন। পাশের ছেলেটি তাড়াতাড়ি বীরেশ্বরকে ধাক্কা দিয়ে জাগিয়ে দিলে। তা'হ'লে কী হবে! তাতেও গুরুমশায়ের হাতে থেকে রেহাই নেই। দুমদাম কয়েকটা কিল চাপড় বীরেশ্বরের পিঠে পড়লো বটে, কিন্তু তার ফল হ'ল উল্টো। সেদিনের পড়া গুরুমশায় আর কিছুতেই বীরেশ্বরের কাছ থেকে আদায় করতে পারলেন না।

বীরেশ্বরের বাবা পরদিন এই মারধোর করবার কথা শুনে গুরুমশায়কে ডেকে ছেলেদের মারধোর না ক'রে মিষ্টি কথায় বা দরকার হ'লে অন্যভাবে শাসন ক'রে লেখাপড়া আদায় ক'রে নিতে বল্‌লেন।

পরের দিন পাঠের সময় গুরুমশাই মিষ্টি কথায় বীরেশ্বরকে জিজ্ঞেস করলেন, "কিরে বিলে, তুই পড়ার সময় ঘুমোস কেন?"

"আমি চোখ বুজে আরও ভাল শুনতে পাই।"

"শুনতে পাস! যে পড়া কাল হয়েছে তা তুই বলতে পারিস?"

"হ্যাঁ"—এই বলে গুরুমশায়কে কালকের পড়াগুলো বীরেশ্বর গড়গড় ক'রে মুখস্থ বলে গেল।

বালকের স্মরণশক্তি দেখে গুরুমশায়ের মনে হ'ল, "এতো সাধারণ ছেলে নয়!"

বীরেশ্বরের ছাত্রজীবনে এইভাব অনেক সময়ই দেখা গিয়েছে। একজন সঙ্গী বইগুলির পাঠ তাকে প'ড়ে শোনাতো আর বীরেশ্বর শুনে পড়া তৈরী ক'রে ফেলতো।

বীরেশ্বরের এই অদ্ভুত স্মরণশক্তির কথা জানতে পেরে ভুবনেশ্বরী দেবী তাঁর আত্মীয় রামচন্দ্র দত্ত মশায়কে বললেন, "বিলেকে তুমি মুখে মুখে কিছু শিখিয়ে দিও না। দেখেছ তো ওর মনে রাখবার শক্তি। যা শুনবে তা আর ভুলবে না।" দত্ত মশায় ভুবনেশ্বরী দেবীর কথায় সানন্দে সায় দিলেন।

রামচন্দ্র দত্ত তখনকার দিনে মেডিক্যাল কলেজের কেমিক্যাল এক্সামিনার ছিলেন। তিনি ছিলেন সংস্কৃত শাস্ত্রে একজন সুপণ্ডিত এবং ঈশ্বর-ভক্ত। দত্ত মশায় তখনকার দিনে আমাদের দেশের ধর্ম-আন্দোলন অর্থাৎ শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংস দেব এবং কেশবচন্দ্র সেন মশায়ের উপদেশ শুনতে প্রায়ই হয় দক্ষিণেশ্বরে না হয় ব্রাহ্মসমাজে যেতেন। তিনিই বীরেশ্বরকে শ্রীরামকৃষ্ণ দেবের কাছে পরে নিয়ে গিয়েছিলেন।

দত্ত মশায় বীরেশ্বরের বাড়ীতেই থাকতেন। বীরেশ্বর রাত্রিতে তার কাছে গল্প শুনতে চাইতো। দত্ত মশায় তাকে সংস্কৃত শাস্ত্রের নানারকম গল্প বলতেন। শোনা যায় যে বীরেশ্বর মাত্র ৭।৮ বৎসর বয়সের সময় সংস্কৃত শব্দের অভিধান "অমর-কোষ" বইখানির সূত্রগুলি মুখে মুখেই মুখস্থ ক'রে ফেলেছিল। এই অল্প বয়সেই তিনি (দত্ত মশায়) বীরেশ্বরকে সংস্কৃত ব্যাকরণ "মুগ্ধবোধের" পাঠও

দিতে আরম্ভ করেন। তিনি বালকের অপূর্ব স্মরণশক্তি দেখে ভুবনেশ্বরী দেবীকে বলতেন, "দেখো, ও বড় হ'লে একটা দিগ্বিজয়ী পণ্ডিত হবে। শঙ্করাচার্য, চৈতন্য মহাপ্রভু পাঁচ ছয় বৎসর বয়সেই এই রকম স্মরণশক্তির পরিচয় দিয়েছিলেন।"

ভুবনেশ্বরী দেবী বলতেন, "শিবের ভূত কিনা! পণ্ডিত না হোক মানুষকে তোলপাড় ক'রে যে বিলে ছাড়বে তা আমি দিব্যি ক'রে বলতে পারি।"

বীরেশ্বরের ছেলেবেলা থেকেই গল্প আর গান শোনার আগ্রহ ছিল খুব বেশী। কৃত্তিবাসী রামায়ণ তাঁর মার কাছ থেকে মুখে মুখে শুনেই প্রায়ই মুখস্থ বলতে পারতো। কথক ঠাকুরদের সেকালের রামায়ণ গান তার খুবই ভাল লাগতো। গায়ক এলে তাকে বীরেশ্বর বাড়ীতে ডেকে এনে রামায়ণ গান না শুনে ছাড়তো না।

একদিন কথক ঠাকুর তার গানে হনুমানের শ্রীরামচন্দ্রের প্রতি অগাধ ভক্তির কথা নানাভাবে সুর ক'রে বলেন। বালকের তা খুব ভাল লাগলো।

বীরেশ্বর গায়ক-ঠাকুরকে প্রশ্ন করে—"এই রামভক্ত হনুমানকে কোথায় পাওয়া যায়?" গায়ক-ঠাকুর বল্লেন যে রাম-ভক্ত হনুমান অমর।

"তবে এখন তাকে কোথায় পাওয়া যায়?" বীরেশ্বর প্রশ্ন ক'রে।

ঠাকুর মশায় তাকে সাধারণ বালক মনে ক'রে বললেন—"কেন বাপু, কারো কলা বাগানে যাও, তা'হ'লেই হনুমানের দেখা পাবে।"

যে কথা সেই কাজ। পাশের বাড়ীর কলা বাগানে যেয়ে হনুমানের দর্শনের জন্য সে ব'সে রইলো যতক্ষণ না রাত্রির অন্ধকার ঘনিয়ে এলো। এতক্ষণ পর্যন্ত বাগানেই বসে থাকল বীরেশ্বর। তার দৃঢ় বিশ্বাস রাম-ভক্ত হনুমানের নিশ্চয়ই দেখা পাওয়া

যাবে। কিন্তু নিরাশ হয়ে বাড়ীতে ফিরে এসে ভুবনেশ্বরী দেবীকে বালক বললো—"কই কথক ঠাকুর যে বললেন হনুমানের দেখা বাগানে গেলে পাওয়া যাবে, আমিতো তা পেলাম না ?"

ভুবনেশ্বরী দেবী ছেলের মনের বিশ্বাস ও ভক্তিকে অতি শ্রদ্ধার সঙ্গে গ্রহণ করে সান্ত্বনা দিয়ে উত্তর করলেন, "বোধ হয় রামভক্ত হনুমান আজ শ্রীরামচন্দ্রের আদেশে অন্য কোনো কাজে গিয়েছে—আর একদিন তোমাকে দর্শন দেবে।"

সত্য সত্যই রামভক্ত হনুমানের চরিত্র বীরেশ্বরের মনে গভীর শ্রদ্ধার ভাব এনে দিয়েছিল। হনুমানের বীরত্ব, হনুমানের প্রভুভক্তি এবং সর্বোপরি হনুমানের আপনার উদ্দেশ্য সাধনের জন্য নিজের শক্তিতে দৃঢ়-বিশ্বাস বালক বীরেশ্বরকে ঐরূপ বীরত্বের জন্য মাতিয়ে তুলেছিল। স্বামী বিবেকানন্দ হ'য়ে তিনি বেলুড় মঠে শ্রীরামচন্দ্রের পূজো প্রচলন ক'রবার ইচ্ছা প্রকাশ করেছিলেন। তাঁর সেই ইচ্ছামত ব্যবস্থা করেন তাঁর গুরুভাই স্বামী ব্রহ্মানন্দ। তিনিই শ্রীরামকৃষ্ণ মিশনের প্রথম অধ্যক্ষ। এখন প্রতি একাদশী তিথিতে পয়ার-ছন্দে লেখা শ্রীরামনাম সংকীর্তন শ্রীরামকৃষ্ণ মিশনের সকল আশ্রম ও বিদ্যালয়ে গাওয়া হয়। পয়ার-ছন্দে লেখা গানের প্রথম পদ তোমরা শুনবে ?

"শুদ্ধব্রহ্ম পরাৎপর রাম
কালাত্মক পরমেশ্বর রাম "—ইত্যাদি

শ্রীরামচন্দ্রের কথা পয়ার ছন্দে ছেলেদের বইয়েতেও তখনকার দিনে লেখা হ'তো। যেমন :—

"দুষ্টমতি লঙ্কাপতি হ'রেনিল সীতাসতী
রামচন্দ্র গুণাধার ত্বরা গিয়ে সিন্ধুপার
ঘোরতর যুদ্ধক'রে বধিলেন লঙ্কেশ্বরে
সীতাসহ পুনরায় চলিলেন অযোধ্যায়।"—ইত্যাদি।

কথক ঠাকুরের কথামত হনুমানজীর দর্শনের জন্য বীরেশ্বর এবাগান-ওবাগানে হানা দিতে সুরু করে। কিন্তু হনুমানের দেখা নেই। এইভাবে বাগানে বাগানে ঘুরতে ঘুরতে বীরেশ্বরের গাছে উঠা বেশ শেখা



হ'য়ে গেল। একদিন দুপুরবেলা বীরেশ্বরকে দেখা গেল পাশের বাড়ীর এক বাগানে। দুপুর বেলায় বীরেশ্বরের দৌরাত্ম্যে সে বাড়ীর কর্তা বিরক্ত হয়ে বীরেশ্বরকে ভয় দেখাবার জন্য বললেন, "এই সব গা'ছে ব্রহ্মদত্যি আছে—। কখন দেখবে ঘাড় মট্‌কে নেবে।"

"ব্রহ্মদত্যি কখন আসে ?"

"যেদিন সুযোগ পাবে সেদিনই সে তার কাজ করবে"—বৃদ্ধ উত্তর করলেন।

বীরেশ্বরের সঙ্গী যারা ছিল তারা সবাই ভয় পেয়ে তাকে প্রশ্ন করে—"তাইতো ভাই বিলে, কী হবে ভাই? চল পালিয়ে যাই—।"

বীরেশ্বর মুচকি হেসে হাত নেড়ে ও চোখ-ইসারায় দেখালো যে বৃদ্ধ চলে গেছে। তারপর ঝপাং করে লাফ দিয়ে আর এক গাছের ডাল ধরে ঝুলতে ঝুলতে উত্তর করলো—"যদি ব্রহ্মদত্যির সঙ্গে দেখা হয় তবে হনুমানের সঙ্গেও দেখা হবে—তাহলে রামচন্দ্রেরও দেখা পাওয়া যাবে—বুঝলি।"

বীরেশ্বরের সঙ্গীটির রামচন্দ্রের জন্য ভাবনা নেই। তার যত ভাবনা ব্রহ্মদত্যির জন্য। "ভাই, যদি সত্যিই ব্রহ্মদত্যি আসে তবে আর রক্ষা থাকবে না"—বালক ভয়ে ভয়ে বীরেশ্বরকে বলতেই বীরেশ্বর ধমক দিয়ে উত্তর করলো—"আহাম্মক কোথাকার! কেউ কিছু বল্‌লেই হল আর কি! আগে আসুক দেখি তারপর দেখা যাবে।"

বীরেশ্বরকে কেউ কিছু বল্‌লেই অমনি আর কিছু বিশ্বাস করতো না। তার অভ্যাসই ছিল, 'দেখবি শুনবি বাজিয়ে নিবি তবে কিছু মেনে নিবি।'

ছোটবেলা থেকেই দলের নেতা বীরেশ্বর। বিকেল বেলা তাকে প্রায়ই দেখা যেত ঠাকুর-দালানের আঙ্গিনায়। সিঁড়ির সকলের উপরের ধাপে ব'সে বীরেশ্বর একের পর এক হুকুম জারি করছে আর তার দলের সকলে সেই আদেশ পালন করতে ব্যস্ত। এই খেলার ধরন এক এক সময় এক রকম হ'তো। কখনো বীরেশ্বর রাজা হ'য়ে বসতো আর তার সঙ্গীদের মধ্যে কেউ হ'তো মন্ত্রী, কেউ হ'তো কোটাল, কেউ হ'তো রাজার সেপাই-সান্ত্রী। বীরেশ্বর যখন রাজা হ'য়ে বসতো তখন

তার চেহারাই যেত বদলে। সত্যি সত্যিই একটা রাজার ভাব এসে যেত বীরেশ্বরের চেহারায় ও চোখে-মুখে।

একদিন বীরেশ্বরের রাজ-দরবার বসেছে। দেশে ভয়ানক চোরের উপদ্রব। কী করে দুষ্টের দমন ক'রে শিষ্টের পালন করা যাবে তারই মন্ত্রণা বসেছে।



"কী মন্ত্রী, রাজ্যের সংবাদ কি ?" রাজা জানতে চাইলেন। "প্রজাবৃন্দ সব সুখে শান্তিতে আছে ত ?"

মন্ত্রী মশায় করজোড়ে নিবেদন করলেন—"আজ্ঞে মহারাজ, রাজ্যের আর সব কুশল। কেবলমাত্র দস্যু-তস্করের উপদ্রব কিঞ্চিৎ বৃদ্ধি পেয়েছে।"

রাজা গর্জন করে উঠলেন—"তবে তোমরা আছ কী করতে ? আজ পর্যন্ত ক'জন দস্যু-তস্কর ধরা হয়েছে—তাদের আমি দেখতে চাই।"

বৃদ্ধ মন্ত্রী রাজার মেজাজ জানতেন। তাই আগে থেকেই কয়েকজন দস্যু-তস্করকে বেঁধে এনে কারাগারে বন্দী ক'রে রেখে দিয়েছিলেন। রাজার আদেশ হ'বা মাত্র তিনি নগর-কোটালকে বললেন—"বন্দীদের দরবারে হাজির কর।" সঙ্গে সঙ্গে অপরাধী দস্যু-তস্করকে দরবারে হাজির করা হ'লো।

বীরেশ্বরের যে সকল বন্ধু দস্যু-তস্কর সেজে তখন সভায় উপস্থিত তারা বীরেশ্বরের চোখ-মুখের চেহারা দেখে ভাবলো এতো সত্যিই রাজা ! কিন্তু কথা বলবার সময় নেই। রাজা তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে তাদের দিকে চেয়ে যেই মৃত্যুদণ্ড ঘোষণা ক'রলেন অমনি তাদের হিড়হিড় ক'রে টেনে নেবার জন্য একদল তাদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়লো—তারাও সঙ্গে সঙ্গে প্রাণের ভয়ে দরবার থেকে পালাবার জন্য ঠাকুর-দালানের উঠান পেরিয়ে সদর দরজার দিকে দিল প্রাণপণে ছুট। বীরেশ্বরের এসব কাণ্ড দেখবার অবকাশ নেই। রাজাসনে বসে তখন সে রাজ্যের গুরু চিন্তায় ব্যস্ত। দারোয়ানদের হাঁকডাকের মধ্যে বীরেশ্বরের এই ভাব ভাঙ্গলে রাজদরবারের সেদিনের মত যবনিকা পাত হ'তো।

ভিন্ন দিন খেলার ধরনও বদলে যেত। একদিন সঙ্গিসাথীদের নিয়ে জোর লুকোচুরি খেলা হচ্ছে। হঠাৎ বীরেশ্বর দোতালার সিঁড়ি থেকে পা ফস্‌কে পড়ে গেল। সিঁড়ির নীচে পড়ে যেয়ে বীরেশ্বরের কপাল কেটে যায়। অনেকক্ষণ অজ্ঞান অবস্থায় থাকবার পর চৈতন্য হ'ল। বাড়ীতে মহা হুলুস্থুল পড়ে গেল। ডাক্তার এসে প্রায় এক ঘণ্টা ধরে চিকিৎসা করলে তবে বীরেশ্বরের জ্ঞান ফিরে আসে।

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ বীরেশ্বরের বালক বয়সে এই মাথা কেটে যাওয়ার কথা শুনে একদিন হঠাৎ বললেন—"জানিস, মা ইচ্ছে ক'রেই ওকে ঐ রকম করে ফেলে দিয়েছিল। নইলে অত ছোট বয়সে এত বিরাট শক্তি ও ধারণ করতে পারতো না।"

বীরেশ্বর যখন বিবেকানন্দ হয়ে শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ স্থাপন করলেন, তখন তাঁর গুরুভাইদের একটা অভ্যাসই হয়েছিল নতুন কেউ মঠে এলেই তার কপাল থেকে সমস্ত গা দেখতেন—কোন কাটা দাগ আছে কিনা? কেউ এ সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করলে তাঁরা বলতেন—"যে ছেলেগুলি বোকা হয় সেগুলির গায়ে বড় কাটা থাকে না। ও সব ম্যাদাটে ছেলে জগতে বিশেষ কিছু করতেও পারে না।"

## বিদ্যালয়ে বীরেশ্বর

১৮৭০ খৃষ্টাব্দ, বীরেশ্বরের বয়স প্রায় ৮ বৎসর। বীরেশ্বরকে ভর্তি করে দেওয়া হ'লো ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের মেট্রোপলিটন ইন্‌স্টিটিউসনে। এই স্কুলটি ছিল কলকাতার সুকিয়া স্ট্রীটে। ঐ জায়গাটি কোথায় জান? এখন যেখানে লাহা বাবুদের লাল রঙের মস্ত বড় বাড়ী কর্ণওয়ালিশ স্ট্রীট জুড়ে রয়েছে ঐখানে।

"যে-খানে সে-খানে ছেলেকে পড়তে দিও না।"—ভুবনেশ্বরী দেবী স্বামীকে আগে বলেছিলেন। বিশ্বনাথ দত্তও সে-কথা ভালভাবে জানতেন। তাই ঠিক হ'লো বীরেশ্বর বিদ্যাসাগরের স্কুলেই পড়বে। বিশ্বনাথ দত্ত পড়েছিলেন তাঁর সময়কার সবচেয়ে নামকরা বাঙ্গালী স্কুল ওরিয়েন্টাল সেমিনারীতে। ঐ স্কুল করেছিলেন তখকনার দিনে কলকাতার খৃষ্টান পাদরীদের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে গৌরমোহন আঢ্য মশাই। সেখানে ভাল মাষ্টার না হ'লে চাকুরীতে ঢোকা যেত না। আবার ছাত্রও যদি ভাল না হ'তো তবে তাকে তিনি ভর্তি

করতেন না। ঐ ওরিয়েণ্টাল সেমিনারী বিদ্যালয়েই রবীন্দ্রনাথও ভর্তি হয়েছিলেন পড়বার জন্য। তখন তাঁর বয়স বীরেশ্বরের মতই ৭।৮ বছর হ'বে। রবীন্দ্রনাথ আর নরেন্দ্রনাথ দু'জনেই প্রায় সম-বয়সী। একজন ভর্তি হ'লেন ওরিয়েণ্টাল সেমিনারীতে আর এক জন হলেন বিদ্যাসাগরের মেট্রোপলিটন স্কুলে।

বীরেশ্বরকে বিদ্যালয়ে ভর্তি করতে নিয়ে গেলে শিক্ষক মশাই তার একটা ভাল নাম দিতে বললেন। বিশ্বনাথ দত্ত মশাই ছেলের নূতন নাম দিলেন "নরেন্দ্রনাথ"। বিলে বা বীরেশ্বর সেই দিন থে:ক হ'ল নরেন্দ্রনাথ অর্থাৎ 'সবার সেরা' মানুষ। কিন্তু কে জানতো যে বীরেশ্বর সত্যই এ-যুগের সবার সেরা মানুষ হবে ?

"আমি ইংরেজী পড়তেও পারবো না—শিখতেও চাই না"—ভুবনেশ্বরী দেবীকে নরেন্দ্রনাথ সাফ্ জানিয়ে দিলো। মহা মুস্কিল! তখনকার দিনে ইংরেজী শেখার ধূম চলেছে, তাতে ইংরেজী না শিখলে চলবে কি ক'রে—বীরেশ্বরের মা'-ত ভেবেই পান না।

বিশ্বনাথ দত্তের ছেলে ইংরেজী শিখবে না! এ'একটা কথা হ'ল। অত বড় ওকালতি, অত নাম, এ-সবই ত' তাকেই ধরতে হবে! সে-ই তো বাপের বড় ছেলে। ভুবনেশ্বরী দেবীর মনে নানা ভাবনা হয়। কিন্তু নরেন্দ্রনাথের ভাগ্য-দেবতা মায়ের ভাবনায় বিচলিত হ'লেন না।

"কেন তুই ইংরেজী শিখবি না"—মা তাকে জিজ্ঞাসা করেন ?

"কয়টা শিখবো—বাংলা, সংস্কৃত আবার ইংরেজী"—বালক উত্তর ক'রে।

তখন বিদ্যাসাগরের বিদ্যালয়ে সংস্কৃত গোড়া থেকেই পড়তে হ'তো। মা তাকে বোঝালেন; সংস্কৃত তো'কে রাম দাদা শেখাবে বাংলা শেখাবে মাস্টার মশাই। আর ইংরেজী তোকে কষ্ট ক'রে

পড়তে হবে না। মুখে মুখে আমি তোকে পড়িয়ে দেবো—তাতেই রাজী হ'ল বীরেশ্বর। মায়ের এক দুর্ভাবনা দূর হ'ল। বীরেশ্বরের ইংরেজী প্রথম পাঠ হ'ল প্যারীচরণ সরকারের লেখা বিখ্যাত ইংরেজী শেখার বই "First Book of Reading" দিয়ে।

তখনকার দিনে ক'জন বড় লোকের বৌ-ঝি ইংরেজী জানতো? ভুবনেশ্বরী দেবী কিন্তু বাংলা ছাড়া ইংরেজী ভাষাও জানতেন। বাংলা তো তিনি ভালই জানতেন। রামায়ণ, মহাভারত ও পুরাণের গল্প বালক নরেন্দ্রনাথ মার কাছ থেকেই মুখে মুখে শিখেছিল। আর ইংরেজী তিনি তাঁর বাবার আগ্রহে শিখেছিলেন মেম মাষ্টারনীর কাছ থেকে। কলকাতায় তখনকার দিনে বাড়ী গিয়ে পাদ্রী মাষ্টার-মাষ্টারনীরা ছেলে-মেয়েদের ইংরেজী পড়াতেন

নরেন্দ্রনাথের ছোট ভাই মহেন্দ্রনাথ দত্ত এই বিষয়ে পরে বলেছেন, "মাতা ভুবনেশ্বরীর পড়াশুনায় একটা বিশেষ অভ্যাস ছিল। দুপুরে কয়েক ঘণ্টা আর রাত্রে কয়েক ঘণ্টা তিনি নিত্য পাঠ করিতেন।.........স্বামীজী বা আমি যে সকল চলিত কবিতা বলিয়া থাকি, সে সকলের অধিকাংশই পূজনীয়া মাতার নিকট হইতে শুনিয়াছি এবং তাহাই অভ্যাস হয়ে গিয়েছে।......অপর সাধারণ হইতে ভ্রাতৃত্রয়ের ,যে বিদ্যানুশীলনের তীব্র চেষ্টা তাহা মাতাপিতার নিকট হইতে আসিয়াছে।" মা বৃদ্ধ বয়সে মৃত্যুর দিন কতক আগে পর্যন্ত দুপুর বেলা ও রাত্রে নিয়মিত বই পড়িতেন।"

বীরেশ্বর পরে ইংরেজী ভাষা এমন দখল করেছিলো যে বিদেশে যেয়ে আমেরিকা বা ইংলণ্ডে যেখানেই ইংরাজীতে বক্তৃতা করতো সেখানেই তাঁর ইংরেজী ভাষার ওপর দখল দেখে সকলের তাক্ লেগে যেত। আর পরে যত বই বীরেশ্বর লিখেছিলো তার মধ্যে মাত্র ৫।৬ খানা ছাড়া আর সব বই-ই অতি সুন্দর ও জোরালো

ইংরেজীতে লেখা বা বক্তৃতা। তাঁর বক্তৃতা শুনে আমেরিকার একজন পণ্ডিত বলেছিলেন—"আমাদের সবগুলো পণ্ডিত একত্র করলেও ওঁর সমান হবে না।"

বীরেশ্বর তখন নরেন্দ্রনাথ নামেই স্কুলে ভর্তি হ'ল। কিছুদিন মধ্যেই দেখা গেল—দুরন্তপনায় ও চট্পটে কথাবার্তায় সে ওস্তাদ। তাতে কোন কোন মাষ্টার মশাই নরেন্দ্রনাথকে খুবই ভালবাসতেন। আবার কেউ-বা ভাবতেন ছেলেটা ভারি ডেপো। ক্লাশে চুপ-চাপ ব'সে থাকবার পাত্র সে মোটেই ছিল না। স্কুল বসবার আগে বা পরে—কিংবা টিফিনের সময় রোজ হয় খেলা-ধূলা, না হয় গল্পের আসর, না হয় গানের আসর বসিয়ে দিত সঙ্গীদের জুটিয়ে নিয়ে। আবার কখনো কখনো বোকা বা অতি শান্ত-শিষ্ট ছেলেদের মুখ ভেংচিয়ে বা তাদের সঙ্গে খোঁচাখুঁচি ক'রে তাদের প্রাণ ওষ্ঠাগত ক'রে তুলতো। নরেন্দ্রনাথ ছেলেবেলা থেকেই কারো ঐ রকম মিনমিনে ভাব দেখতে পারতো না। নরেন্দ্রনাথের ছেলেবেলার কথা বলতে যেয়ে তাঁর ভাই মহেন্দ্রনাথ দত্ত বলেছেন—"তাঁর ভিতরে প্রচুর শক্তি ছিল, তাই সে কখনো চুপ করে বসে থাকতে পারতো না।"

নরেন্দ্রনাথ স্বামী বিবেকানন্দ হয়ে এই ছেলেবেলার দুষ্টুমির কথা মনে করে বলেছিলেন, "দ্যাখ্, আমি গোড়া থেকেই ডানপিটে ছেলে ছিলুম।" আর একজনকে বলেছিলেন—"আমার মধ্যে একটা অফুরন্ত শক্তি উঠ্ছে ছেলেবেলায়ই বেশ তার টের পেতুম।"

এই শক্তির জের যখন যার ওপর পড়তো তার প্রাণ যাবার উপক্রম হ'ত। একদিন ক্লাসে তার এক সহপাঠী বোকার মত এমন একটা অন্যায় কাজ ক'রে বসলো, যার জন্য সবাই তাকে ক্ষেপাতে সুরু করলে। সেই ছেলেটি কিন্তু তাতে ভ্রূক্ষেপও করলে না। এইভাবে দু'একদিন যাবার পর মাষ্টার মশায়ের কানে কথাটা উঠলো

তিনি ছেলেটিকে ক্লাসে ঐরূপ করতে বারণ করলেন। কিন্তু ফল হ'ল উল্টো। ছেলেটা ক্লাসের মধ্যে নানারকম ঢং ক'রে মাষ্টার মশাইকেও বিরক্ত ক'রে তুললো। তা দেখে ক্লাসের সবাই হেসে অস্থির। নরেন্দ্রনাথও—তাতে যোগ দিলো। নরেন্দ্রনাথকেও ঐভাবে হাসতে দেখে মাস্টারমশাই তাকে কান ধরে টেনে ক্লাসের বাইরে বার ক'রে দেন। নরেন্দ্রনাথের কান ছিঁড়ে খুব রক্ত পড়তে থাকে। ছেলেরাও সব ভয়ে কাঠ হয়ে রইলো। এদিকে নরেন্দ্রনাথ বাড়ী ফিরলে বাড়ীতে একটা হৈ-চৈ বেঁধে যায়। বিশ্বনাথ দত্ত মশাই রেগে বললেন যে আদালতে নালিশ করবেন। তিনি আইনজীবী—তাই আইনের পথ ভাবলেন।

বিশ্বনাথ দত্তের কাকা বলেন, "মাস্টারকে একটা উপযুক্ত শিক্ষা দিয়ে দাও।"

নরেন্দ্রনাথ কিন্তু বাবাকে বলে, "না আমি ইস্কুলে যাবো। আমি ত কোন দোষ করি নি।"

কথাটা শেষ পর্যন্ত বিদ্যাসাগর মশায়ের কানে উঠলো। তিনি ঘটনা সব শুনে রেগে অস্থির। সেইদিন থেকে তিনি নিয়ম ক'রে দিলেন যে তাঁর স্কুলে কোন দিন কেউ ছেলেদের মারতে পারবে না। সে নিয়ম মেট্রোপলিটন স্কুলে আজও চলে আসছে।

মাষ্টার মশাইদের গোপনে ডেকে বিদ্যাসাগর মশাই ছাত্রদের মারধোর বন্ধ করার জন্য নিয়ম করে দিলেন। ছাত্রদের মধ্যে যারা ভাল ছেলে বিদ্যাসাগরের কাছে তাদের সাত খুন মাপ, কিন্তু লেখাপড়ায় ভাল না হলে আর স্বভাব-চরিত্র যদি ভাল না হতো তবে বিদ্যাসাগর মশাই সেই সব ছেলেদের ভালবাসতেন না।

এই ঘটনার কিছুদিন আগের কথা। একদিন ক্লাসের পড়া হচ্ছে ; ভূগোলের মাষ্টার মশাই নরেন্দ্রনাথকে হঠাৎ মেরে বসলেন।

কারণ হ'ল যে তাঁর মতে নরেন্দ্রনাথ পড়া ভুল বল্‌ছে অথচ তা স্বীকার করছে না।

নরেন্দ্রনাথ দৃঢ়ভাবে জবাব দিল—"আমি সত্য বলছি—মিথ্যা বলি নি।"

মাষ্টার মশাই যখন বই খুলে দেখেন যে নরেন্দ্রনাথের কথাই সত্যি তখন তাঁর মনে খুব দুঃখ হ'ল।

নরেন্দ্রনাথ বাড়ীতে এসে মার কাছে সব কথা বললো। ভুবনেশ্বরী দেবী নরেন্দ্রনাথের কথা সব শুনে বললেন—"দেখো, বাবা সত্যকে কখনও জীবনে ছেড়ো না। সত্যের জন্য যদি দুঃখ-কষ্ট ভোগও হয়, তাতে কখনও পিছু হটবে না।"

বালক নরেন্দ্রনাথ মার কথা শুনে প্রতিজ্ঞা করলো—"যা সত্য বলে জানবো জীবনে তা কিছুতেই ছাড়বো না।" মার জন্য নরেন্দ্রনাথের ভক্তি-শ্রদ্ধা এরপর থেকে দশ গুণ বেড়ে যায়। শৈশবের এইসব কথা বড় হয়ে নরেন্দ্রনাথ সকলকে বলতো, "দেখ, যে মাকে ভক্তি করতে পারে না, সে কখনও বড় হতে পারে না।"

এই বিদ্যালয়ে পড়বার সময় নরেন্দ্রনাথ এমন একটি কাজ করেছিল যার জন্য পাড়ায় তার বেশ নাম হয়ে যায়! আর তার মা ভুবনেশ্বরী দেবী সেইদিন থেকে তাকে একজন বীর ছেলে বলেও ধারণা করতে লাগলেন।

সেদিন ছিল চৈত্র-সংক্রান্তির চড়ক-পূজো। নরেন্দ্রনাথের বাড়ীর কাছেই সিমলা পাড়ার বিখ্যাত বড়লোক ছাতুবাবুর বাজারে বসেছে চড়ক-পূজার মেলা। এখনও এই মেলা কলকাতার বিডন ষ্ট্রীটের ধারে ছাতুবাবু-লাটুবাবুর বাজারের পাশে প্রতি বৎসরই বসে থাকে চৈত্র-সংক্রান্তির দিন। সেদিন চড়কের মেলা দেখতে নরেন্দ্রনাথও আরও সকল ছেলের সঙ্গে দলবেঁধে গিয়েছে। মেলা দেখে নরেন্দ্রনাথ

আনন্দের সঙ্গে ফিরছেন সন্ধ্যার সময়; হাতে তার মাটির পুতুল শিব-পার্বতী-আরও কত কী। নরেনন্দ্রাথ হঠাৎ দেখে সকলে চীৎকার করে পথ থেকে পালিয়ে যাচ্ছে যে যে-দিকে পারছে। এক নিমেষে রাস্তার মাঝখানটা প্রায় খালি। কী ব্যাপার! একটা পাল্কী-গাড়ীর ঘোড়া ক্ষেপে গিয়ে রাশ-লাগাম ছিঁড়ে ফেলে তীরের মত ছুটছে। এই সময় একজন মেয়ে মানুষ দৌড়ে পালাবার জন্য ছুটাছুটি করতে গিয়ে কোল থেকে তার ছেলেটিকে রাস্তার মাঝখানে ফেলে দেন। গোলমালে এমন ঘটনা কত হয়। কিন্তু পাগলা ঘোড়াটা যে দিকে ছুটে আসছে ছেলেটি তার সামনে পড়ে যাওয়ায় সবাই ভয়ে হৈ-হৈ করে উঠলো। কিন্তু কেউ এগিয়ে যেতে সাহস করলো না। ছেলেটাকে বুঝি পাগলা ঘোড়াটা তবে লাথি মেরেই শেষ করে দিয়ে যাবে! ঘটনাটির বিবরণ পড়তে এখন যত সময় লাগলো, তখন কিন্তু এই ব্যাপার ঘটে গিয়েছিল চোখের পলকে। সেই মুহূর্তে ঝড়ের বেগে রাস্তার ভীড় ঠেলে ঝাঁপিয়ে পড়লো আর একটি তেজীয়ান বালক। বাজের মত ছোঁ মেরে ঐ ছেলেটাকে রাস্তা থেকে টেনে এনে ফুটপাথে ফেলে দিল। ঘোড়াটা আর একটু হ'লেই ওকে পায়ের তলায় মাড়িয়ে দিত। ছেলেটিকে ফিরে পেয়ে মায়ের কি আনন্দ!

রাস্তার লোক দুধারে দাঁড়িয়ে অবাক হয়ে এই তাজ্জব ব্যাপার দেখলো। সবার গা কাঁটা দিয়ে উঠেছে এই দস্যি ছেলের কাণ্ড দেখে!

"আরে! আর একটু হ'লে ওটাও-ত' মরতো। দুটোই এক সঙ্গে যেতো সাবাড় হয়ে।"

"কি দস্যি ছেলে বাবা!"

"গোঁয়ার ডানপিটে ছেলে যা হোক!"

"আর ওর বয়সই বা কত!"

একজন বললেন, "আরে ও যে আমাদের বীরু বিশ্বনাথ দত্তের ছেলে।"

আর একজন উত্তর করলেন—"আরে এত বড় ঘরের ছেলে কিনা একটা ছোটলোকের ছেলের জন্য প্রাণ দিতে গিয়েছিল! কী তাজ্জব ব্যাপার!"

ধীরে ধীরে লোকের ভীড় কমে যায়। নরেন্দ্রনাথ বাড়ী ফিরে আসার আগেই ভুবনেশ্বরী দেবীর কাছে তাঁর পুত্রের এই দস্যিপনার খবর পৌঁছে গেছে। নরেন্দ্রনাথ অক্ষত দেহে ফিরে এলে মা তাকে বুকে জড়িয়ে ধরলেন। মায়ের দু'চোখ ভরা জল। ঝি-চাকর সব বলাবলি করতে লাগলো—"না মা, দাদাবাবুর এত বাড়াবাড়ি মোটেই ভাল নয়। ওঁকে শাসন কর, না হলে দেখবে একটা কাণ্ড একদিন সত্যি-সত্যিই ঘটবে।"

ভুবনেশ্বরী দেবী চোখের জল মুছে তার আদরের দুরন্ত বীরেশ্বরের গাল দুটি ধরে বললেন, "বাবা, এইতো চাই, নিজের প্রাণ দিয়েও মানুষকে বিপদ থেকে বাঁচাবে।"

বিশ্বনাথ দত্তের কাছে সব রকমের লোকই মামলা-মোকদ্দমার জন্য পরামর্শ নিতে আসতেন। তার মধ্যে কেউ-বা হিন্দু, কেউ-বা মুসলমান, কেউ-বা অন্য জাতের। বাড়ীর বড় ছেলে বীরেশ্বর তাদের সকলের কাছেই আদরের। এদের মধ্যে একজন ছিলেন বৃদ্ধ মৌলানা সাহেব। তিনি বৈঠকখানায় এসে যখন বিশ্রাম করতেন, তখন বীরেশ্বর তাঁর কাছে যেয়ে বায়না ধরতো গল্প শোনবার জন্য। বৃদ্ধ মৌলানা সাহেব কয়েক-দিনের মধ্যেই বীরেশ্বরের আপন জন হয়ে উঠলেন। চাচা-সাহেব আর তাঁর আদরের বিলুবাবু। বিলুবাবু গল্পপ্রিয়। চাচা-সাহেবও গল্প বলতে ভালবাসেন। গল্পের বিষয় ছিল ভারতবর্ষ থেকে হাঁটাপথে আফগানিস্তানের দুর্গম পর্বতের ভেতর দিয়ে যে পথ আরব মরুভূমির

রাজ্যে চলে গিয়েছে তার কথা। সে পথে যেতে পথিকের পদে পদে মৃত্যুর ভয়। কিন্তু পথিকের তাতে ভ্রূক্ষেপও নেই। গল্পের নায়কের সাথে বিলুবাবুও কল্পনার রাজ্যে হাঁটতে হাঁটতে চাচা-সাহেবের সঙ্গে কখনও মুসলমানদের পরম পবিত্র তীর্থক্ষেত্র মক্কা-মদিনায় চলে যেতো—আবার কখনও চলে যেতো সেই কারবালার প্রান্তরে যেখানে হাসান আর হোসেন দুই ভাই ধর্মযুদ্ধে প্রাণ দিয়েছিলেন। তাঁদের মৃত্যুর ব্যথা আজও লক্ষ লক্ষ ধর্মপ্রাণ মানুষকে চঞ্চল ক'রে তোলে। এই দুই শহীদের জন্য আজও লক্ষ লক্ষ মানুষ বুক চাপড়ে কাঁদে—"হায় হাসান, হায় হোসেন।"

গল্পের রেশ ফুরিয়ে আসতেই বিলুবাবুর ফরমাস হয় আর একটা গল্প বলবার জন্য। এমনিভাবে তাদের মধ্যে বেশ ভাব জমে ওঠে। মাঝে মাঝে নবীন শ্রোতার জন্য চাচা-সাহেব কিশ্‌মিশ্‌, বেদানা ফলটলও নিয়ে আসেন। বিলুবাব তা পেয়ে কত খুশী!

একদিন দত্তবাড়ীর অন্দর-মহলে দুই ঝি বিলুর সঙ্গে মহা গোলমাল বাঁধিয়ে দিলো। তারা যতই বলে, 'হাতে ওটা কী আছে আগে ফেলে দিয়ে কলতলায় গিয়ে স্নান করে এস, তবে ঘরে ঢুকতে দেব"—বিলু ততই একরোখা হয়ে বলে—"কেন কী হয়েছে?"

"কী হয়েছে? সর্বনাশ! চাচা-সাহেব সন্দেশ দিয়েছে; তাই তুই খেয়েছিস। আবার বাড়ীর মধ্যে তা এনে হাজির করেছিস? জাত-কুল আর রইলো না!"

বিলে হি হি করে হেসেই কুটপাট। জাত রইলো না! জাত গেল কোথায়?

গোলমাল শুনে ভুবনেশ্বরী দেবী বাইরে এসে বিলেকে নিয়ে স্নান করিয়ে ঘরে আনেন। কিন্তু বিলের মনে সন্দেহ প্রবল হ'লো—জাতটা তার গেল কোথায়?

পরদিন চাচা-সাহেব এসেই হাঁক দিলেন 'আল্লাহ লাহ-লিল্লা মহম্মদে রসুলিল্লা''—আল্লাহ (ভগবান) মহান এবং মহম্মদ তার অবতার বা প্রেরিত পুরুষ। হাঁক শুনেই বিল্লবাবু চাচা-সাহেবের কাছে যথারীতি এসে হাজির। দেখে তার জন্য চাচা-সাহেবের সন্দেশও হাজির। বালক যথারীতি সন্দেশের সদ্‌গতি করে গল্প শুনতে বসে যায়।

এমনি করে বিলুর দিন চলতে থাকে। চাচা-সাহেব সবদিন বিলু-বাবুর সঙ্গে আলাপ জমাতে পারেন না। বিশ্বনাথ দত্ত তাঁর বৈষয়িক কাজ শেষ হ'লে প্রায় দিনই বৃদ্ধ মৌলানা সাহেবের সঙ্গে ইতিহাস, দর্শন ও শাস্ত্রের কথা জুড়ে দেন। বিলুর কানে সেই আলাপের রেশ কিছু কিছু ভেসে আসে। যেমন বালক রবীন্দ্রনাথ তাঁর দাদা-মশায়দের সাহিত্য-আলোচনা বা গীতিবাদ্য প্রভৃতির রেশ ঠাকুর বাড়ীর বৈঠক-খানার বন্ধ-দরজার ফাঁক দিয়েই শুনতো। বালক-কবির মতোই বালক-বীরেশ্বরও উন্মনা হ'য়ে উঠতো।

বৈঠকখানা ঘরে একদিন জোর আলোচনা চলছে বাদ্‌শাহ আকবরের সম্বন্ধে। বালক বিলুর কানে এলো বিশ্বনাথ দত্ত বলছেন—"আকবর বাদশার মত মানুষ ক'টা হয়। তিনি ভারতবর্ষের প্রাণের কথা ঠিক যেন ধরতে পেরেছিলেন। তাইতো তাঁর কাছে হিন্দু-মুসলমান সবাই সমান বলে বোধ হ'তো।"

বৃদ্ধ মৌলানা উত্তর করলেন, "শুধু তাই নয়। তিনি ভারতবর্ষের মুনি-ঋষিদের উপদেশ মত শেষ বয়সে ভগবানের চিন্তায় দিন কাটাতে লাগলেন!"

বিশ্বনাথ দত্ত তাকে বলেন, "দেখুন, আকবর বাদশাহের 'দীন এলাহি' ধর্ম যদি অন্যান্য মোগল বাদশাহেরা ঠিক ঠিক ভাবে মেনে চলতেন, তাহলে ভারতবর্ষের হিন্দু-মুসলমান সত্যিকারের ভাই-ভাই হ'তো।"

দত্ত মশায়ের কথা ফুরোয় না। তিনি মনের আবেগে ফার্সী বয়াৎ আবৃত্তি করে চলেন পারস্যের কবি শেখ সাদী কিংবা হাফেজের লেখা থেকে। এদের কাছে সব মানুষই সমান।

বীরেশ্বরের কানে এই কথাবর্তার রেশ ভেসে আসে। "সব মানুষই সমান।" সব মানুষই যদি সমান, বীরেশ্বরের মনে ভাবনা জাগে, তবে বাবার বৈঠকখানায় হিন্দুর জন্য, মুসলমানের জন্য, খৃষ্টানের জন্য আলাদা আলাদা হুঁকো কেন? একে আর একজনের ছোঁয়া খায় না কেন? বীরেশ্বরের কি খেয়াল হ'লো জাত সত্যিই যায় কিনা তা আজ পরখ করে দেখবে।

চাচা-সাহেব চ'লে গেলে ক্রমে অন্য সবও চলে যান। বৈঠকখানা ঘর খালি হয়ে যায়। বিশ্বনাথ বাবুও কাজে বাড়ীর ভিতরে চলে যান। ঘর খালি প'ড়ে থাকে। বীরেশ্বর সুযোগ বুঝে ঘরের মধ্যে ঢুকে দরজাটাকে বন্ধ ক'রে দিলো। ঘরের কোণে যেখানে সারি সারি হুঁকো রয়েছে বীরেশ্বর সোজা সেখানে চলে যায়। এদিক সেদিক দেখে পর পর হুঁকোতে মুখ লাগিয়ে টান দিতে আরম্ভ করলো। একবার হিন্দুর হুঁকোয়, একবার মুসলমানের হুঁকোয়, আর একবার খৃষ্টানের হুঁকোয়। তারপর ব্রাহ্মণের হুঁকোয়, আবার শূদ্রের হুঁকোয় টান দিতে লাগলো বীরেশ্বর। কিন্তু জাত তার গেল কৈ?

"কি বিলুবাবু, কী করা হচ্ছে"—বলে দরজা ঠেলে বিশ্বনাথবাবু বৈঠকখানা-ঘরে ঢুকে ছেলের কাণ্ড দেখে তো অবাক। বিশ্বনাথবাবু দ্বিতীয় কথা বলবার আগেই বীরেশ্বর বাবাকে জিজ্ঞেস করে—"বাবা, হিন্দুর হুঁকোয় মুসলমানের হুঁকোয় টান দিলুম; আমার জাতটা তো উড়ে গেল না।"

বিশ্বনাথ বাবু ছেলের মনের সন্দেহ দূর করার জন্য বল্লেন, "ছুঁলেই কি জাত যায়রে দুষ্টু! একজনের মুখের এটো আর একজনের না খাওয়াই ভাল! বড় হ'লে তুই নিজেই বুঝতে পারবি।"

বীরেশ্বরের এই সময় থেকে হুঁকোর প্রতি একটা ভালবাসা গড়ে উঠে। হুঁকোটা তার একটা ভারি মজার বস্তু হয়ে দাঁড়ালো। খেলো



হুঁকো হাতে ক'রে বালক বীরেশ্বর সারাটা বাড়ীময় ঘুরে বেড়াতো

আর মাঝে মাঝে ফুরুৎ ফুরুৎ ক'রে হুঁকো টানতো। পারিবারিক কাহিনী থেকে জানা যায় "এটা ছিল বালক বিলুর ( বীরেশ্বরের ) বড় আমোদের খেলা। বিশ্বনাথ দত্তের যে কোচোয়ান রামসীতার গল্প ক'রে বীরেশ্বরের আপনার জন হয়েছিল, সেও গল্প বলার সময় ফুরুৎ ফুরুৎ হুঁকো খেতো। আর বীরেশ্বরকে কখন কখন ঘোড়ার পিঠে বসিয়ে দিয়ে তার হাতে শুক্‌নো হুঁকোতে খালি কলকে বসিয়ে দিয়ে মজা ক'রে বলতো, "বিল্লুবাবু, হুক্কা পিও, হুক্কা পিও।"

বীরেশ্বরের আর একটি জিনিস তার শিশু-মনের কাছে খুবই অবাক্ মনে হ'তো, তা হ'লো বাড়ীতে সন্ন্যাসী বা ফকিরের আবির্ভাব। ফকির বা সন্ন্যাসীর প্রতি দত্ত-পরিবরের সকলেরই একটা শ্রদ্ধার ভাব ছিল। ভগবানের নাম নিয়ে যখনই এঁরা দত্ত-বাড়ীর দরজায় হাঁক দিয়ে দাঁড়াতেন অমনি বীরেশ্বর ও তার ভাইবোন ছুটে আসতো তাদের হাতে কিছু প্রণামী দেবার জন্য। এ-কথা তাদের ব'লে দিতে হ'তো না। বিশ্বনাথ দত্তের উদার মনোভাব ছেলেদের মনে ছোটবেলা থেকেই গেঁথে গিয়েছিল। মাণিক ফকিরের দরগা থেকে যে মুসলমান ফকির প্রতিদিন সন্ধ্যা-বেলা পীরের গান গাইতে গাইতে এসে দরজায় হাঁক দিতেন, তার কথা দত্ত-পরিবারের কাহিনী থেকেই জানা যায়। তিনি সন্ধ্যা-বেলা এসেই "মাণিক পীর" বলে হাঁক দিতেন। একটি কেরোসিনের ডিব্বার আলোতে আঙ্গুলের ডগাটা ছুঁইয়ে নিয়ে ছেলেমেয়েদের কপালে ফোঁটা দিয়ে আশীর্বাদ করে বলতেন, "মাণিক পীর তোমাদের মঙ্গল করুন।" ছেলে-মেয়ের দল সবাই ভক্তিভরে প্রণাম ক'রে দু-একটা পয়সা প্রণামী ফকিরের হাতে তুলে দিলে তিনি মাণিক পীরের জয়ধ্বনি করতে করতে সন্ধ্যার অন্ধকারে হারিয়ে যেতেন। এটা তখনকার দিনে নিত্যকারের ব্যাপার ছিল।

বীরেশ্বরের মনে এই সময়ে যে-ভাবটি খুব বেশী দেখা দিয়েছিলো তা হ'লো সন্ন্যাসীর জন্য কিছু-না-কিছু দান করা। এক একদিন এমন হ'তো যে সে হাতের কাছে যা পেতো তাই সন্ন্যাসী বা ফকিরকে দান ক'রে বসতো। এর জন্য কোন কোন দিন তাকে ঘরের মধ্যে বন্দী করে পর্যন্ত রাখতে হ'তো। কিন্তু ভুবনেশ্বরী দেবী সে কথা শুনতে পেলেই বীরেশ্বরকে মুক্তি দিয়ে বলতেন, "ও যে শিবের চেলা! ওকে তোরা অমন ক'রে বাঁধিস নি।" শিবের চেলা! সত্যিই বীরেশ্বর স্বামী বিবেকানন্দ সন্ন্যাসী হয়ে যখন জগৎকে মাতিয়ে তুলেছিলেন, তখন তাঁর এক আমেরিকান শিষ্যাকে (মিসেস্ বুল) এক চিঠিতে নিজের কথা বলতে গিয়ে তিনি লিখেছিলেন—"হে আমার শিব, তুমিই আমার ভাল তুমিই আমার মন্দ। প্রভো, বাল্যকাল থেকেই আমি তোমার চরণে আশ্রয় নিয়েছি। গ্রীষ্মপ্রধান দেশে বা হিমানীমণ্ডিত মেরু-প্রদেশে, পর্বত-চূড়ায় বা মহাসমুদ্রের অতল তলে—যেখানেই যাই, তুমি আমার সঙ্গে সঙ্গে থাকবে। তুমিই আমার গতি, আমার নিয়ন্তা, আমার শরণ, আমার সখা, আমার গুরু, আমার ঈশ্বর; তুমিই আমার স্বরূপ। তুমি আমায় কখনই ত্যাগ করবে না,—কখনই না, এ আমি ঠিক জানি।"

বীরেশ্বরের অন্যতম বাল্যসঙ্গী ছিলেন মনোমোহন গাঙ্গুলী। তিনি বড় হ'য়ে একজন ইঞ্জিনিয়ার হন। বীরেশ্বরের একখানা জীবনী তিনি পরে লিখেছিলেন। তাতে তিনি লিখেছেন, "This child Vireswar was religious from his infancy; many anecdotes are related expressing his religious nature even at an early age.'

অর্থাৎ বীরেশ্বর শৈশবকাল থেকেই ধর্মের প্রতি অনুরাগী ছিল। শৈশবকালে তার চরিত্রে নানা রকমে ধর্মের ভাব প্রকাশ পেতো। সেই বিষয়ে অনেক কাহিনী জানা যায়।

কথকতা বা রামায়ণ গান বাংলাদেশের পাড়ায় পাড়ায় তখনকার দিনে হ'তো। কথক ঠাকুরমশায় সুর ক'রে কংসের কারগারে শ্রীকৃষ্ণের জন্মের কথা, কুরুক্ষেত্রে কুরু ও পাণ্ডবদের ১৮ দিনের মহা-যুদ্ধের কথা, ভক্ত উদ্ধবের উপাখ্যান, আরও কত কি সুন্দর সুন্দর কথা শোনান। একদিন পাড়ায় গোবিন্দ অধিকারীর যাত্রা হবে জানতে পেয়েই বীরেশ্বর তার ছোট ভাই মহেন্দ্রনাথকে সঙ্গে ক'রে রাত্রি-বেলায় সেখানে গিয়ে হাজির। রাত্রি জেগে যাত্রা শুনতে ভারি মজা। বীরেশ্বর বাড়ীতে এসে যাত্রা সুরু ক'রে দিলো। ঢাল, তলোয়ার, সেপাই-লস্কর সব তার চাই। বিকেল-বেলা হ'তেই প্রতিদিন পূজোর দালানের সামনে যাত্রার পালা সুরু হ'তো। বীরেশ্বর কখনো রাজা, কখনো বা শিব সেজে আসরে নামতো। তার সুন্দর ডাগর ডাগর চোখ আর মাথায় ঝাঁক্‌ড়া কোঁকড়ান চুলের উপর যখন রাজার মুকুট বা শিবের জটা পড়ানো হ'তো, তখন তাকে কি সুন্দরই না দেখাতো!

বীরেশ্বরের ছোট ভাই মহেন্দ্রনাথ বলেন যে একদিন যাত্রার এক পালায় যমদূত এসে আসরে হাজির। পালা আরম্ভ হ'বার আগেই যমদূত আসরে নেচে নেচে গাইতে লাগলো—

"তোমার যম এসেছে নিতে।
তুমি দেরী ক'রো না যেতে।"

বীরেশ্বরের ঐ যমদূতের নেচে নেচে গানের পাঠ ভারি ভাল লাগলো। বাড়ীতে বীরেশ্বরের ঐ গানের চোটে কারো আর রেহাই নেই। এই খেয়াল কয়েক দিন পর কমে গেলে তবে পেলো সকলে রক্ষে।

আর এক দিন পাড়ায় রামায়ণ গান হচ্ছে। লোক গিজগিজ করছে। আজ 'রাবণ-বধ' পালা হবে। রাম, সীতা, লক্ষ্মণ একে একে সাজ-গোজ ক'রে আসরে এসে দাঁড়ালেন। মেয়েরা সবাই উলুধ্বনি দিয়ে রাম-সীতাকে আসরে বরণ করে নিলেন। আসর জমে উঠলো। কিছুক্ষণ পরেই মস্তবড় ল্যাজ কাঁধের ওপর ফেলে বীর হনুমান আসরে এসে হাজির। অমনি চার দিক থেকে হাততালি পড়তে লাগলো। বীরেশ্বরও আসরে গান শুনতে এসেছে। সে-ও সমানে কখনো-বা হাততালি দিচ্ছে—কখনো-বা বলছে, "হনু, এই দিকে—এই দিকে"—অর্থাৎ তাদের দিকে চাইতে হবে।

অধিকারীমশায় শ্রীরামচন্দ্রের বন্দনা ক'রে পালাগান সুরু ক'রলেন। চামর দুলিয়ে দুলিয়ে নেচে নেচে সীতাহরণের কাহিনী বর্ণনা ক'রে তিনি অশোকবনে বন্দিনী সীতার দুঃখের কথা আসরে নিবেদন করলেন। তারপর পয়ারছন্দে তিনি বর্ণনা করেন সীতার উদ্ধারের জন্য লঙ্কায় শ্রীরামচন্দ্রের যুদ্ধে যাবার কথা। লঙ্কায় শ্রীরামচন্দ্রের সঙ্গে রাবণের সৈন্যদলের যুদ্ধের কথা কৃত্তিবাসী রামায়ণের পয়ার থেকে ব'লে চলেন কথকঠাকুর—

"অরণ্যকাণ্ডেতে সীতা হরিল রাবণ।
কিষ্কিন্ধ্যাকাণ্ডেতে হয় সুগ্রীব মিলন॥
সুন্দর কাণ্ডেতে হয় সাগর বন্ধন।
লঙ্কাকাণ্ডে রাম-রাবণের মহা রণ॥
বান্ধা গেল সাগর, কটক হৈল পার।
দিনে দিনে রাবণের টুটে অহংকার॥

রাবণও কম নয়। শ্রীরামচন্দ্র জানেন যে রাবণ বিশ্বশ্রবা মুনির ছেলে। দেবতাদের শাপে রাক্ষসী নিকষার ছেলে হয়ে জন্ম নিয়েছে। আবার এ-কথাও জানেন যে তাঁর হাতেই রাবণের মৃত্যু, তা-হলেই

রাবণের রাক্ষস-জন্মের শেষ হবে—রাবণ পাবে মুক্তি। রাবণ ছিলেন রাজা—তিনি বিনা যুদ্ধে আত্মসমর্পণ করবেন না। যদি মরতেই হয় তো বীরের মত যুদ্ধ করেই শ্রীরামচন্দ্রের হাতে মরবেন।

"রামের সর্বাঙ্গ রাজা করে নিরীক্ষণ।
সাক্ষাৎ বিরাট মূর্তি ব্রহ্ম সনাতন॥"

রাবণ একের পর এক তাঁর বীর সেনাপতিদের যুদ্ধে পাঠাতে লাগলেন।

ধূম্রাক্ষ, অকম্পন, বজ্রদংষ্ট্র, প্রহস্ত ইত্যাদি সেনাপতি সকলেই শ্রীরামচন্দ্রের হাতে প্রাণ হারালেন। তারপর গেলেন রাবণের ভাই কুম্ভকর্ণ; বিভীষণের ছেলে তরণীসেন। সর্বশেষ নিজের দুই পুত্র বীরবাহু এবং ইন্দ্রজিতকেও বারে বারে যুদ্ধে পাঠালেন, কিন্তু তারা কেউ আর ফিরে এলো না। রাবণ তখন নিজেই যুদ্ধে যাবার কথা ঘোষণা করলেন। কথকঠাকুর সুর করে বললেন:

"রাবণ বলিলা—'ধনু ধরিতে যে জানে।
ছোট বড় রাক্ষস চলুক মোর সনে॥
সেনাপতি পড়িল রাজ্যের চূড়ামণি।
আর কাকে পাঠাইব, যাইব আপনি॥'
ধনুক ধরিতে জানে যত নিশাচর।
রাবণের সঙ্গে চলে করিতে সমর॥"

রাবণের স্ত্রী মন্দোদরী রাবণকে যুদ্ধে না যাবার জন্য বার বার অনুরোধ করলেন। কিন্তু রাবণ আপন প্রতিজ্ঞায় অটল। রাবণ বলেন:

"দেখিব করিয়া যুদ্ধ মারি কিবা মরি।
ক্রন্দন সম্বরি গৃহে যাহ মন্দোদরী॥"

রামচন্দ্রও জানেন রাবণকে সহজে মারা যাবে না। রাবণের মৃত্যু হবে ব্রহ্মবাণে। এক স্ফটিকস্তম্ভের ভিতর সোনার লঙ্কাপুরীর মধ্যে তা লুকোনো রয়েছে। সেই ব্রহ্মবাণ চুরি ক'রে আনবার জন্য হনুমানকে পাঠানো হ'লো। সে বাণের হদিস একমাত্র মন্দোদরীই জানেন। অবশেষে হনুমান জ্যোতিষ ব্রাহ্মণ সেজে মন্দোদরীকে ভুলিয়ে স্ফটিকের স্তম্ভ ভেঙ্গে রাবণের মৃত্যুবাণ এনে রামচন্দ্রকে দিলে তবে তিনি রাবণ বধ করতে পারলেন।

রাবণ যখন মৃত্যুশয্যায় তখন রামচন্দ্র তাঁর কাছে রাজার কী কর্তব্য তা জানতে চাইলেন। রাবণ রামচন্দ্রকে যে চারটি কথা বলেছিলেন একে একে কথকঠাকুর গান গেয়ে গেয়ে তা সকলকে শোনাতে লাগলেন।

লক্ষ্মণ মনে মনে ভাবলেন রাবণের কাছে রাজনীতি কি শুনবো ? রামচন্দ্র তখন তাকে বোঝান—

"অমূল্য রতন যখন কু-স্থানেতে রয়।
গ্রহণ করিতে পারে শাস্ত্রে হেন কয়॥"

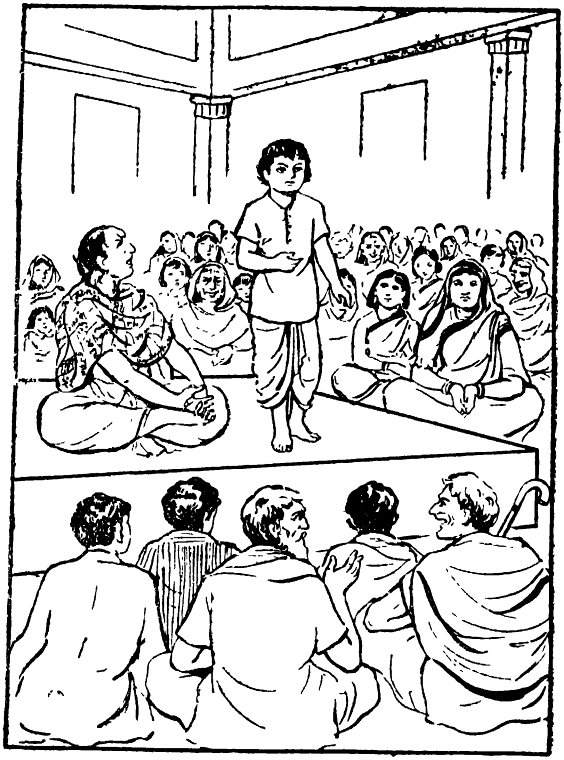
রাবণের উপদেশের কথা কথকঠাকুর তখন বলতে আরম্ভ করলেন—

"করিতে উত্তম কর্ম বাঞ্ছা যবে হবে।
আলস্য ত্যাজিয়া তাহা তখনি করিবে॥
অতএব শুভ কর্ম শীঘ্র করা ভাল।
হেলায় রাখিয়ে ইষ্ট আজি বৃথা হ'ল॥"

কিন্তু মুশকিল হ'লো কথকঠাকুরের। তিনি রাবণের উপদেশের পয়ার মেলাতে পারছেন না। বার বার একই পয়ার বলতে লাগলেন। শ্রোতাদের মধ্যে যারা চালাক তারা বুঝতে পারলেন।

"কি ঠাকুর মশায়, আর বুঝি মনে নেই ?"

গায়ক বেগতিক দেখে কি বলতে যাবেন এমন সময় তড়াক ক'রে



লাফ দিয়ে দাঁড়াল এক বালক আসরের মধ্যে। গড়গড় করে সে রামায়ণ থেকে ব'লে চলে—

"দেখি দুঃখ মানবের ভাবিনু অন্তরে।
কিরূপে যাইতে জীব পারে স্বর্গপুরে॥
অক্লেশে যাইতে সব পারে দেবলোকে।
নির্মাব স্বর্গের পথ বিশ্বকর্মা ডেকে॥
করিব এমন পথ সব যেন যায়।
মর্ত হ'তে স্বর্গ সিঁড়ি রচিব ত্বরায়॥

হেলায় রাখিয়ে হৈল বহুদিন গত।
তারপর তব সনে যুদ্ধ উপস্থিত ॥
অতএব শুভকর্ম শীঘ্র করা ভাল।
হেলায় রাখিয়ে ইষ্ট আজি বৃথা হ'ল ॥"

শোনা যায় সেদিন রামায়ণ গানের আসরে বালক বীরেশ্বরই এই কাণ্ডটি করেছিল। সেদিনই ঠিক 'রাবণ-বধ'-এর পালা হয়েছিল কিনা তা সঠিক জানা যায়নি। তবে বীরেশ্বরের এই কাহিনীটি সত্য।

বালক বীরেশ্বরের স্মরণশক্তি দেখে শ্রোতার দল চারদিক থেকে "সাধু, সাধু" করে উঠলো। বালককে ঠাকুরমশায় জিজ্ঞেস করেন, "তুমি কী করে পয়ার জানলে ?" বালক উত্তর করলো—"মার কাছে শুনেছি, তাই মনে আছে।"

বীরেশ্বর যখন স্বামী বিবেকানন্দ হ'য়ে দেশ-বিদেশে নাম ক'রে বেলুড় মঠে ফিরলেন তখন একদিন রামায়ণের কথা উঠলো। তাঁর শিষ্য শরৎচন্দ্র চক্রবর্তী-মশায় তখনকার দিনের নামকরা কবি মাইকেল মধুসূদনের কথা তোলেন। কারণ তিনি তখন নতুন ছন্দে রামায়ণের 'মেঘনাদ-বধ' কাব্য লিখে খুব নাম করেছেন। তাতে কেউ তাকে ভাল বলছে, কেউ-বা তাকে ঠাট্টা করছে। স্বামীজী বললেন, "পরে লোকে ঐসব বই আদর করবে।" এই ব'লে শিষ্যকে মঠের লাইব্রেরী থেকে 'মেঘনাদ-বধ' কাব্য আনতে বললেন। বই এলে শিষ্যকে জিজ্ঞেস করলেন—"বল্ দিকি, এই কাব্যের কোন্ অংশটি সব চেয়ে ভাল ?"

শিষ্য চুপ।

তখন স্বামীজী বললেন, "যেখানে ইন্দ্রজিৎ যুদ্ধে মারা গেছে। রাণী মন্দোদরী রাবণকে যুদ্ধে যেতে বারণ করছেন, কিন্তু রাবণ পুত্র-শোক মন থেকে জোর ক'রে ঠেলে ফেলে মহাবীরের মত যুদ্ধের জন্য যাত্রা করছেন, আর বলছেন, 'যা হবার হোক্ গে। আমার কর্তব্য আমি ভুলবো না, এতে দুনিয়া থাক্ আর যাক্।' এই হচ্ছে মহাবীরের বাক্য !"

স্বামীজী ভাবের মুখে বই থেকে সেই অংশ বীরদর্পে সকলকে পড়ে শোনালেন।

বীরেশ্বরের নিজের জীবনেও ছেলেবেলা থেকেই এই বীরভাব দেখা গেছে। একদিন দলবেঁধে বীরেশ্বর গঙ্গার ধারে কেল্লা (ফোর্ট উইলিয়ম) দেখবার জন্য সিমলার বাড়ী থেকে হেঁটে রওনা হ'লো। বাড়ী থেকে প্রায় ৩।৪ মাইল পথ হাঁটতে হবে, আবার ফিরেও আসতে হবে। পথ হাঁটতে হাঁটতে হাসি-ঠাট্টা ক'রে সবাই চলেছে। প্রায় ধর্মতলার পথ ধর ধর হয়েছে; এমন সময় দেখা গেল সঙ্গীদের মধ্যে একজন আর পথ চলতে না পেরে ক্লান্ত হয়ে ব'সে পড়েছে। সঙ্গীদের মধ্যে অনেকেই তাকে ঠাট্টা-বিদ্রূপ করতে লাগলো। ওকে সঙ্গে করে গেলে দেরী হবে দেখে সবাই তাকে বললো, "তুই তবে এখানে ব'সে থাক, আমরা ফিরে যাবার সময় তোকে নিয়ে যাব।"

বীরেশ্বর দলের নেতা। সে বললো, "তোরা সব চলে যা। আমি ওকে ছেড়ে যেতে পারবো না।"

আর সকলে চলে গেল। বীরেশ্বর তার বন্ধুর কাছে গিয়ে দেখে জ্বরে গা পুড়ে যাচ্ছে। কী করা যায়?

বন্ধুর হাত কাঁধের উপরে ফেলে তাকে নিয়ে ধীরে ধীরে রাস্তা ধরে চলতে সুরু করলো সে।

অনেকক্ষণ পরে ছেলের দল কেল্লা থেকে ফিরে এসে দেখে সেখানে ঐ ছেলেটিও নেই, বীরেশ্বরও নেই।

ভয়ে ভয়ে বাড়ী ফিরে এসে ছেলের দল দেখে বীরেশ্বর বাড়ীর দাওয়ায় ব'সে আছে। সব কথা জিজ্ঞেস করতে বললো, "তোরা সবাই ওকে ফেলে চলে গেলি! তোরা সব কি? ওকে গাড়ী করে বাড়ী পৌঁছে দিয়ে এলুম। ওর ভারী জ্বর এসেছে। ওর মা সবাইকে গালমন্দ করলেন।"

সঙ্গীর দল ভাবলো—"ভাগ্যিস্ বীরেশ্বর ও-কে গাড়ী ক'রে বাড়ী ফিরিয়ে এনেছিলো, তা না হ'লে আজ কাণ্ডই হ'তো

# খেলাধূলা-গান-বাজনায় বীরেশ্বর

বীরেশ্বর দুষ্টুমিতে যেমন ওস্তাদ খেলাধূলাতেও তেমনি ছোটবেলা থেকেই ছিল পটু। এখন যাকে ব্যাট-বল বা ক্রিকেট বলা হয় তখনকার দিনে বীরেশ্বরের সঙ্গিসাথীর দল তাকে বলতো "ব্যাটম্বল"। বীরেশ্বর এই খেলায় কিছুদিনের মধ্যেই ওস্তাদ হ'য়ে উঠলো। বাড়ীর বাইরের উঠান বা ধারে-কাছের ফাঁকা জায়গায় এই খেলা প্রায় দিনই বিকেল-বেলা হ'তো—যা এখন পাড়ায় পাড়ায় তোমরাও খেলে থাক। বীরেশ্বরের বল ছোঁড়বার, লুফে নেবার নিশানা যেমন ছিল ওস্তাদী ধরনের, বল ঠিক ঠিক ভাবে ব্যাট দিয়ে মারবার কায়দাও ছিল তার তেমনি পাকা।

বীরেশ্বর যেমন ব্যাটম্বল খেলায় ওস্তাদ ছিল, তেমনি ছিল সে কপাটি খেলায়ও। এই খেলাটি প্রায়ই জমতো স্কুলের সঙ্গিসাথীদের নিয়ে। সকলের সঙ্গে ভাব করে নিয়ে একটা দল গড়ে তুলতে বীরেশ্বর ছিল ওস্তাদ। আবার খেলার সময় দুই দলে ঝগড়া-বিবাদ তাকেই মেটাতে হ'তো। তার মধ্যে এমন একটা শক্তি ছোট-বেলা থেকেই প্রকাশ হ'তে থাকে যাকে বলা হয় "নেতাগিরি"। এখন যে কথা বলা হয়—"Leaders are born and never made"—অর্থাৎ ফরমাস দিয়ে নেতা তৈরী করা যায় না—নেতা জন্মায়;—ছেলেবেলা থেকেই বীরেশ্বরের সেই ভাব দেখা দিতে থাকে।

একদিন বীরেশ্বরের বন্ধুরা সব ঠিক ক'রলো যে শিবপুরের বোটানিকাল গার্ডেন দেখতে যাবে তারা। যে কথা সেই কাজ। পরামর্শ হ'লো যে ফেরবার পথে মেটেবুরুজে নবাব ওয়াজেদ আলীর চিড়িয়াখানাও দেখে আসবে।

নবাব ওয়াজেদ আলী অযোধ্যার নবাব ছিলেন। ইংরেজের সঙ্গে তাঁর বিবাদ হওয়ায় তাঁকে বন্দী ক'রে কলকাতায় এনে রাখা হয়েছিল। এখানে তিনি মস্ত বড় বাগান-বাড়ীতে থাকতেন। তাঁর গান-বাজনার খুব সখ ছিল। তাঁর বাড়ীতে নানারকমের পশুপক্ষীও রাখতেন তিনি। বীরেশ্বরের সময়ও নবাবের বংশধরেরা ঐ পশুশালা রেখেছিলেন।

সকাল-বেলা চাঁদপাল ঘাট থেকে টাপুরে ডিঙ্গী ভাড়া ক'রে বোটানিকাল গার্ডেনে গিয়ে খাওয়া-দাওয়া বেড়ানো সেরে ফেরবার পথে নৌকোতে একজনের হঠাৎ ক'রলো অসুখ। বেচারা সামলাতে না পেরে নৌকোর মধ্যে বমি ক'রে ফেললে। নৌকোর মাঝিগুলো ছিল খারাপ ধরনের লোক। ওরা ছেলেদের এই বিপদে সাহায্য তো ক'রলই না, বরং বকাবকি সুরু ক'রে দিলো। শেষ পর্যন্ত তাদের ভয় দেখিয়ে বললো যে যদি ঐ বমি তারা ধুয়ে-মুছে না দেয় তবে তাদের রক্ষে নেই।

ছেলেদের মধ্যে বড় যারা তারা বললে, "একটা মেথর ডেকে নৌকো ধুইয়ে নাওগে, আমরা পয়সা দিচ্ছি।" মাঝিরা বললো, "ও সব কথা শুনিনে। নৌকো ধুয়ে দেবে তবে নামতে দেবো।"

"আমরা ঐসব নোংরা ঘাটবো না।"—ছেলেরা উত্তর করলো।

"তবে আমরাও ছাড়বো না।"—মাঝির দল উত্তর করে। নৌকো ওরা কিছুতেই পাড়ে ভেড়াবে না। একটা মারামারি হ'বার উপক্রম!

এই রকম কথা-কাটাকাটি চলতে চলতে নৌকো স্রোতের ধাক্কায় একটু পাড়ের কাছে ভিড়তেই বালক বীরেশ্বর দেখে গঙ্গার রাস্তা দিয়ে দু'জন ইংরেজ সৈনিক হেলে দুলে বেড়াচ্ছে। বীরেশ্বরের মাথায় একটা বুদ্ধি খেলে গেল। গোলমালের মধ্যে সে ধারের আর একখানা নৌকোতে পা দিয়ে এক লাফে ডাঙ্গায় পড়েই দৌড়ে ঐ সাহেব দু'জনের কাছে

গিয়ে ভাঙ্গা ইংরাজীতে তাদের বিপদের কথা ব'লে ওদের হাত ধ'রে টেনে গঙ্গার ধারে এনে হাজির করলো। সাহেব দু'জনকে দেখে মাঝির দল ঘাবড়ে গেল। যেই ওরা চোখ রাঙিয়ে হুকুম করলো—"অভি লেড়কা লোগকো ছোড় দো।" অমনি সুড়সুড় ক'রে "আভি দেতা হ্যায় হুজুর, জলদি দেতা হ্যায় হুজুড়" ব'লে ছেলেদের ছেড়ে দিয়ে মাঝিরা রক্ষা পায়।

মাঝির হাত থেকে ছাড়া পেয়ে সবাই বীরেশ্বরকে ঘিরে ধ'রে জিজ্ঞেস করে, "কী ক'রে তুই সাহেবকে আনতে পারলি ?"

বীরেশ্বর মাতব্বরের মত উত্তর করে—"তোরা তো চেঁচামেচি করেও আজ মার খেতিস্। আমি বুদ্ধি করে সাহেবদের কাছে দৌড়ে গিয়ে বললুম 'Sir, very danger, Sir, come, save'.—বাস্, সাহেব দুটো আমার মুখের দিকে চেয়ে কী বলাবলি করলো, তারপর এখানে চলে এলো।"

"তুই আমাদের আজ বাঁচিয়েছিস্। সাধে কি বলি তুই আমাদের লীডর !"

শোনা যায়, বীরেশ্বরের বুদ্ধি দেখে সাহেব দু'জন তাদের সঙ্গে সেদিন থিয়েটার দেখবার জন্য তাকে নিমন্ত্রণও করেছিল। বীরেশ্বরের সেদিন অবশ্য থিয়েটারে আর যাওয়া হয়নি।

বীরেশ্বর আর একটি খেলায়ও ওস্তাদ ছিল—তা হ'লো মারবেল। তার আবার কত রকমের নাম ছিল—গাব্বু, পিল, ঘরপার ইত্যাদি। বীরেশ্বর এই সব খেলায় খুব নিখুঁত টিপ মারতে পারতো। আর খেলায় সে ছেলেদের মারবেলগুলি একের পর এক জিতে নিতো। দিনে প্রায় ৩০-৪০টি ক'রে মারবেল তার পকেটে আসতো। আবার হেরে-যাওয়া ছেলের দল তার কাছে কান্নাকাটি করলেই বীরেশ্বর সেগুলি ফিরিয়ে দিতো। বড় হয়েও বীরেশ্বরের এই মারবেল খেলার

ঝোঁক যায়নি। মহেন্দ্রনাথ দত্তের কাহিনী থেকে জানা যায় যে বি. এ. পরীক্ষায় পাশ করবার পর বীরেশ্বর যখন হাইকোর্টে যেতে সুরু করেছে তখনও তার এই অভ্যাস পুরোদমেই ছিলো। একদিন খুড়োমশায়ের সঙ্গে খেয়ে-দেয়ে হাইকোর্টে যাবার সময় বীরেশ্বর দেখলো উঠানে একদল ছেলে মারবেল খেলছে। খেলা দেখেই বীরেশ্বর ( তখন যুবক নরেন্দ্রনাথ ) ছোঁ মেরে একজনের হাত থেকে মারবেল কেড়ে নিয়ে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে গাবব্, পিল, ঘরপার প্রভৃতি খেলে কয়েক মিনিটের মধ্যে সকলকে ঘায়েল ক'রে দিলো।

সব মারবেল জিতে নিয়ে নরেন্দ্রনাথ গর্বের সঙ্গে বললো, "দেখলি হাতের টিপ?"

ছেলের দল, নরেন্দ্রনাথের অবাক কাণ্ড দেখে জিজ্ঞেস করে, "কি করে তুমি এমন টিপ মারো?

নরেন্দ্রনাথ বললে, "এটাও জানিস নে! মারবেলের সঙ্গে, হাতের সঙ্গে আর চোখের সঙ্গে আগে এক ক'রে নিতে হয়। তারপর টিপ ছুঁড়লে ঠিক ঠিক লেগে যাবে, বুঝলি!"—এই ঘটনাও আমরা তাঁর ছোট ভাইয়ের কাহিনী থেকেই জানতে পারি।

এ-ছাড়া সেকালের কলকাতায় ঘুড়ি-ওড়ানো একটা মস্ত বড় ব্যাপার ছিল। বীরেশ্বর ঘুড়ি-ওড়ানোতে, এমন কি পায়রা ওড়ানো খেলাতেও যোগ দিয়েছে বলে জানা গেছে। তবে কুঁড়েমির প্রশ্রয় দেয়, এমন কোনো খেলাতে বীরেশ্বর আনন্দ পেতো না। শোনা যায় লাটিম খেলায় তার উৎসাহ ছিল না। লুকোচুরি খেলায় একবার প'ড়ে গিয়ে কপাল কেটে বসলো। সে দাগ জীবনে আর কখনো মিলিয়ে যায়নি।

বীরেশ্বরের খেলাধূলার ঝোঁক তার শরীর গঠনের দিকে খুবই সাহায্য ক'রেছে। বড় হ'য়ে তাই নেতিয়ে-পড়া ছেলেপুলে দেখলেই

তিনি রেগে গিয়ে বলতেন, "যা, ফুটবল খেলগে, যা, ওতেই তোদের মুক্তি আসবে।" অর্থাৎ আগে শক্তি অর্জন কর, তারপর সব হবে। দুর্বল মানুষ আর দুর্বল জাত কোনটাই পৃথিবীর কোন কাজে লাগে না।

বীরেশ্বর যখন ১৬।১৭ বছরের যুবক তখন থেকেই আমরা তাকে দেখতে পাই জিমনাস্টিকের আখড়ায়। প্রথমে বীরেশ্বর সিমলা পাড়ায় অম্বিকাচরণ গুহের আখড়ায় কুস্তি, ডন, বৈঠক, ডাম্বেল ইত্যাদি শিখতে ভর্তি হয়। পরে 'হিন্দু-মেলা'র প্রতিষ্ঠাতা নবগোপাল মিত্তি যখন কর্ণওয়ালিশ স্ট্রিটের ওপর (এখন যেখানে 'সাধারণ ব্রাহ্ম-সমাজ' হ'য়েছে) তাঁর আখড়া খুললেন বীরেশ্বর সেখানে ভর্তি হ'লো। এখানে কুস্তি-লড়া থেকে সুরু ক'রে বারের খেলা, নানারকমের স্প্রীং-য়ের খেলা, বক্সিং, লাঠি-খেলা, এমন কি তলোয়ারের খেলা পর্যন্ত বীরেশ্বর শিখেছিল। এমনি ক'রে ছোটবেলা থেকেই ডানপিটে বীরেশ্বর শরীরটাকে মজবুত করবার জন্য ব্যায়াম-চর্চা করতে সুরু করে। বীরেশ্বরের শরীরটা যাতে মজবুত হয়, সেদিকে তার বাবারও বিশেষ নজর ছিল। তখন বীরেশ্বর মেট্রোপলিটন স্কুলে পড়ে। বয়স ১৪।১৫ বছর হবে—অষ্টম শ্রেণীর ছাত্র। ইংরাজী ১৮৭৫।৭৬ খ্রীষ্টাব্দ হবে।

এই সময়ে চড়ুইভাতি করবার দিকে বীরেশ্বরের খুব ঝোঁক দেখা দেয়। বন্ধুবান্ধবদের কাছ থেকে পয়সা তুলে পোলাও, মাংস, নানারকমের খিচুড়ী ও বিভিন্ন রকমের খাবার নিজের হাতে তৈরী ক'রে সে সকলকে খাওয়াতো। এইভাবে ছোটবেলা থেকেই বীরেশ্বর রন্ধনে পটু হ'য়ে ওঠে এবং সঙ্গে সঙ্গে ভোজনেও। তার বাবা বিশ্বনাথ দত্ত খাওয়া-দাওয়াতে রাজসিক ছিলেন। পোলাও, মাংস ইত্যাদি তাঁর খুবই প্রিয় ছিল। বীরেশ্বরেরও ছোট-

বেলা থেকেই প্রিয় খাবার ছিল মাংস; আর সঙ্গে খুব ঝাল না হ'লে চলতো না তার। ফল হ'ল বীরেশ্বরের পেটের কঠিন পীড়া দেখা দিল। অসুখ অল্প দিনে কিছুতেই কমলো না। মাসাবধিকাল তার এই অসুখ বেড়েই চলে। দেখতে দেখতে বীরেশ্বরের চেহারা অস্থি-চর্মসার হ'য়ে গেলো। বাড়ীর সকলের খুবই ভাবনা। বীরেশ্বরের বাবা বিশ্বনাথ দত্ত তখন মধ্যপ্রদেশে রায়পুরে ওকালতির কাজকর্ম করছেন। বীরেশ্বরের অসুখের খবর পেয়েই তিনি বাড়ীতে লিখে পাঠালেন, "বীরেশ্বর যেন তার মাকে নিয়ে রায়পুরে চ'লে আসে। এখানকার জলবায়ু খুব ভাল। কিছুদিন এখানে থাকলেই বীরেশ্বরের স্বাস্থ্য ভাল হবে।" বীরেশ্বর রায়পুরে প্রায় দুই বৎসর থাকে। তবে তার শরীর ভাল হয়।

বিশ্বনাথ দত্ত ছেলের শরীরটাকে মজবুত ক'রে গড়ে তোলবার জন্য নবগোপাল মিত্তির আখড়ায় ব্যায়াম-শিক্ষার জন্য লাগিয়ে দিলেন। দলবল নিয়ে বীরেশ্বর শরীর-গঠনের কাজে লেগে গেলো। লাভ হ'লো এই যে এই ব্যায়াম করবার ফলে তার শরীর এমন সুন্দর ও শক্ত হ'য়ে গড়ে উঠলো যে তাকে দেখলে মনে হ'তো যেন গ্রীক পুরাণের দেবতাদের মধ্যে কেউ এসে বাংলার দত্ত-পরিবারে জন্মগ্রহণ করেছে। বীরেশ্বর বিবেকানন্দ হ'য়ে তাঁর গুরু-ভাইদের জন্য নিয়ম করে দিয়েছিলেন যে সন্ন্যাসী হ'লেও দেহটাকে সুস্থ ও সবল রাখবার জন্য সকলকেই ব্যায়াম করতে হবে। তাই স্বদেশী-যুগে আমাদের দেশে যখন যুবকেরা দেশের সেবার জন্য দল গড়তে লাগলো তারা সকলেই আগে ব্যায়াম ক'রে দেহটাকে সুস্থ ও সবল ক'রে নিতো। বিবেকানন্দ তাদের আদর্শ হ'য়ে উঠলো। কারণ তাঁর কথাই ছিল, "সুস্থ ও সবল দেহেই সুস্থ ও সবল মন বাস করে।"

## বিদ্যার্থী বিবেকানন্দ

সন্ন্যাসী বিবেকানন্দ দেশের ছেলেদের ঢ'লে-পড়া ভাব দেখলেই বলতেন, "যা, ফুটবল খেলগে, যা—ওতেই তোদের মুক্তি হ'বে।"

এই জিমনাস্টিক শেখবার সময় বীরেশ্বর এমন দু'একটি কাজ করেছিল যার কথা আজও মুখে মুখে শোনা যায়। নবগোপাল মিত্তির-মশায়ের আখড়ায় "ট্রাপিজ" খেলা তখন শেখান হচ্ছে। একদিন মিত্তিরমশাই নিজে আসতে পারেননি। তিনি বীরেশ্বর ও তার দলবলের সকলকে বলে দিলেন যে তারা গিয়ে খেলা অভ্যাস করতে থাকুক। কিন্তু মুস্কিল হ'লো ট্রাপিজের দোলনাটাকে যে কাঠের সঙ্গে খাটানো হ'বে সেটাকে কিছুতেই ছেলেরা গর্তের মধ্যে দিয়ে দাঁড় করাতে পারে না। ছেলেদেরও জেদ হ'লো যে করেই হোক ওটাকে দাঁড় করাতেই হবে। ছেলেদের হৈ হৈ শব্দে রাস্তায় লোকজন জড় হয়ে যায়।

বীরেশ্বর দেখে সেই সব দর্শকদের মধ্যে একজন সাহেব দাঁড়িয়ে। জাহাজের নাবিকের পোশাক পড়া। বীরেশ্বর ছুটে গিয়ে তাকে সাহায্য করবার জন্য অনুরোধ করতেই সে এসে হাত লাগালো তাদের সঙ্গে। কিন্তু ঐ ভারী কাঠের মাথায় দড়ি বেঁধে টেনে তুলতে গেলে দড়ি ছিঁড়ে কাঠটা সাহেবের মাথার ওপর প'ড়ে যায়। সাহেব ত' অজ্ঞান হ'য়ে মাটিতে প'ড়ে গেল। এই কাণ্ড দেখে লোকজন সব যে যার মত ছুট দিল। বীরেশ্বর এখানেও নেতার মত সাথীদের নিয়ে সাহেবকে ধরাধরি ক'রে সামনের 'ট্রেনিং একাডেমি' স্কুলে নিয়ে যায়। তারপর ডাক্তার ডেকে এনে সাহেবের চিকিৎসার ব্যবস্থা ক'রে দিয়ে নবগোপাল মিত্তির মশায়কে খবর দিলে। কয়েক দিন চিকিৎসার পর সাহেব সুস্থ হ'লে তা'কে যথাস্থানে পাঠানোর ব্যবস্থা করা হয়।

নবগোপাল মিত্তির মশায়ের কলকাতায় তখন খুব নাম। তিনি 'হিন্দু-মেলা' নাম দিয়ে একটি দল গড়ে তুলেছিলেন। সেখানে দেশের পরাধীনতার কথা আলোচনা করা হ'তো—আর তিনি বড় বড় লোকদের ডেকে এনে সেখানে বক্তৃতা দেওয়াতেন, স্বদেশী গান গাওয়াতেন। আর দেশের মধ্যে যারা ভাল কোন কাজ বা সাহসের পরিচয় দিতো তাদের প্রত্যেককে ঐ সভায় পুরস্কার দেওয়া হ'তো। ফি বছরই 'হিন্দু-মেলা'র বাৎসরিক উৎসবের সময় তিনি প্রদর্শনীরও ব্যবস্থা করতেন, এবং সেই সঙ্গে লাঠি-খেলা, ছোরা-খেলা বা জিমনাস্টিক প্রভৃতি দেখাবারও ব্যবস্থা করা হ'তো। এই হিন্দু-মেলাতেই রবীন্দ্রনাথ তাঁর প্রথম কবিতা ১৭ বছর বয়সের সময় পড়ে শুনিয়েছিলেন। তাঁর দাদারা এখানে তখন স্বদেশী গান এবং স্বদেশী ভাব প্রচার করতেন। একবার নবগোপাল মিত্তির মশায় তাঁর নিজের দল নিয়ে 'হিন্দু-মেলা'য় খেলা দেখাতে এলেন। বীরেশ্বর ( তখন নরেন্দ্রনাথ ) ১৫।১৬ বছর বয়সের যুবক এবং ঐ দলের একজন বড় খেলোয়াড়। সেবার ঐ মেলায় ডাক্তার রামচন্দ্র দত্তমশাইও উপস্থিত ছিলেন। তিনি নরেন্দ্রনাথকে দেখেই ইশারা ক'রে বলেন নরেন্দ্রনাথ যেন না খেলে। অর্থাৎ একটু দাম বাড়ুক। অভিভাবকের কথা নরেন্দ্রনাথ ফেলতে পারে না—চুপ-চাপ দাঁড়িয়ে আছে। কিন্তু তার সমস্ত শরীরটা খেলবার জন্য নিস্‌পিস্ করতে লাগলো। হাবভাব দেখে রামচন্দ্র দত্ত বললেন, "খবরদার বিলে, খেলবিনে কিন্তু।"

এদিকে একটার পর একটা খেলা হয়ে যেতে লাগলো। শেষে যখন বার আর ট্রাপিজের (Trapeze) খেলা সুরু হ'লো, তখন দেখা গেল দলের ছেলেগুলো ভাল খেলা দেখাতে পারছে না। নরেন্দ্রনাথ সব ভুলে গিয়ে এক দৌড়ে বারের খেলায় যোগ দিলো। সেদিন সবচেয়ে

ভালো খেলা দেখিয়ে প্রথম পুরস্কার নিয়ে নরেন্দ্রনাথ বাড়ী ফিরেছিলো। কারণ সত্যিকারের খেলোয়াড়ের মনে কোন রকম হিংসা, দ্বেষ ও অহংকার থাকে না। তাই-তো বলা হয়—"Sportsman's Spirit"—খেলোয়াড়ী মনোভাব। হারজিত যাই হোক্ একজন সত্যিকারের খেলোয়াড় মনটাকে কখনো ছোট করবে না। গীতায় যাকে আরও বড় ক'রে বলা হয়েছে জয়-পরাজয়, লাভ-ক্ষতি, সুখ-দুঃখ সকল অবস্থায় যার মন অটল, তাকে যোগী বলা হয়। নরেন্দ্রনাথ ছোটবেলা থেকেই যথার্থ খেলোয়াড় আর বালক-যোগী।

এই কুস্তি করবার অভ্যাস নরেন্দ্রনাথ জীবনের কোন সময়ই ছাড়েনি। নরেন্দ্রনাথ যখন কলেজের ছাত্র, তখনও তার ব্যায়াম, কুস্তি, লাঠি-খেলা, মুগুর-ভাজা সবই চলেছে। এই কাজে তার এক বড় সাকৃরেদ ছিল—নাম তার রাখালচন্দ্র ঘোষ—দূর সম্পর্কের আত্মীয়। দু'জনেই সমান বয়সের। এক পাড়ায় থাকা হয় এবং এক জায়গায়ই রাত্রিতে পড়াশুনাও করা হয়। একদিন রাত্রিতে রাখাল নরেন্দ্রনাথের সঙ্গে বাজি ধরলো যে সে এখন কিছুতেই Peacock March করতে পারবে না। Peacock March হ'লো মাথাটা নীচের দিকে ক'রে হাতের উপর ভর দিয়ে পা-দুটো উপরের দিকে সোজা ঠেলে দিয়ে ময়ূরের মত ক'রে চলা। রাত তখন দুপুর। দুই বন্ধুতে কথা কাটাকাটি সুরু হলো। রাখাল বলে তুই কিছুতেই পারবিনে। নরেন্দ্রনাথ বলে নিশ্চয়ই পারবো। রাখাল বলে যদি পারিস্ তবে তুই এক টাকা পাবি আর হারলে আমাকে এক টাকা দিতে হবে।

আর যায় কোথা? নরেন্দ্রনাথ তড়াক্ ক'রে উঠে মালকোঁচা ক'রে পা-দুটো উপরের দিকে ঠেলে দিয়ে ময়ূরের মত হাঁটতে সুরু ক'রে দিলে উঠানের ওপর। রাখালচন্দ্র তার সঙ্গে সঙ্গে চলতে সুরু করলো। দুজনের ছুটোপাটিতে বাড়ীতে লোকজন জেগে যায়। মা-বাবা বকতে সুরু করলেন—

"তোরা কি দুটো দস্যি এসে জড়ো হয়েছিস ? রাত দুপুরে এখন তোদের জিমনাস্টিক হচ্ছে ?" বকাবকি করে তবে দু'জনকে ঘরে পাঠানো হয়।

বীরেশ্বরের আর একটি শখের ব্যাপার ছিল ঘোড়ায় চড়া। তখনও কলকাতায় ঘোড়ার ট্রাম চলতে সুরু করেনি। কাজেই বড় লোকেদের বাড়ী জুড়ি ঘোড়ার গাড়ী ও তার কোচোয়ান থাকতেই হতো। বীরেশ্বরের বাবারও তাই ছিল। সেই কোচোয়ানের সঙ্গে মাঝে মাঝেই বীরেশ্বরকে দেখা যেত সিমলা পাড়ার রাস্তায় সাদা বর্মী পনি ঘোড়ার পিঠে চড়ে সে মজা লুঠছে।

ঘোড়া-চড়ার ব্যাপারটি নরেন্দ্রনাথ বেশ ভালোভাবেই শিখেছিল। ১৮৮৯ খ্রীষ্টাব্দে যখন গৃহ ত্যাগ ক'রে নরেন্দ্রনাথ সমস্ত ভারতবর্ষ একা একা ঘুরে বেড়াচ্ছে, তখন সে একজন পাকা ঘোড়সওয়ার। তার জীবনের ঘটনা থেকে জানা যায় যে, রাজপুতানার খেতরী রাজ্যের রাজা অজিত সিং-এর বাড়ীতে যখন ১৮৯১ খ্রীষ্টাব্দে নরেন্দ্রনাথ বাস করছে, তখন সে একজন পাকা সওয়ারী।

মহারাজ অজিত সিংহ-এর জীবনী থেকেই জানা গেছে যে, তাঁরা দু'জনে রাজপুতানার পাহাড়ে পাহাড়ে ঘোড়ায় চড়ে ঘুরে বেড়াতেন।

এ শুধু পনি ঘোড়ার সওয়ার হ'লে চলতো না। এখানে পাকা সোওয়ারী হ'তে হ'য়েছে। কাজেই স্কুলে ও কলেজে পড়বার সময়ই যে এ বিদ্যাটিও নরেন্দ্রনাথ আয়ত্ত করেছিল তা বোঝা যায়।

এমন কি সন্ন্যাসী বিবেকানন্দ হ'য়ে আমেরিকা-লণ্ডন ঘুরে এসেও তিনি ঘোড়ায় চড়ার অভ্যাসটি ছাড়েননি। ১৮৯৭ সালে আলমোড়ায় বেড়াতে গেছেন। শোনেন যে বাঙ্গালার বিখ্যাত নেতা অশ্বিনীকুমার দত্ত মশায় সেখানে তখন আছেন। একদিন ভোরবেলা অশ্বিনীকুমার দত্তের সঙ্গে দেখা করতে যান। এই ঘটনার বিবরণ থেকে জানা যায় যে,

তিনি সন্ন্যাসীর বেশে রাজার মত ঘোড়ায় চড়েই সেদিন পাহাড়ের উপর দিয়ে গিয়েছিলেন। তাঁর এক চিঠিতে তিনি এই ঘটনার কথা উল্লেখ ক'রে লিখেছেন, "তুমি যদি আমাকে পার্বত্য হরিণের মত পাহাড়ে লাফিয়ে বেড়াতে দেখতে, অথবা ঊর্ধ্বশ্বাসে ঘোড়া ছুটিয়ে পাহাড়ের রাস্তায় চড়াই-উৎরাই করতে দেখতে, তাহলে খুবই আশ্চর্য হ'য়ে যেতে........।" আবার আর এক জায়গায় লিখেছেন, "এরপর যখন দেখা হবে, দেখবে আমার চেহারা কুস্তিগীরের মত ........কুড়ি-ত্রিশ মাইল একনাগারে দৌড়ে গিয়েও কিছুমাত্র বেদনা বা পরিশ্রম বোধ হচ্ছে না।"

নিয়মিত ব্যায়ামচর্চার মধ্যে নরেন্দ্রনাথের বক্সিং-এরও বেশ অভ্যাস ছিল। নবগোপাল মিত্তির মশায়ের আখড়ায়ই নরেন্দ্রনাথ বক্সিং খেলা শেখে। এই বক্সিং-এর পরিচয় পরে সন্ন্যাসী বিবেকানন্দ হ'য়েও তিনি দিয়েছেন। একবার রেলগাড়ীতে যাচ্ছেন। পরনে সন্ন্যাসীর বেশ-গেরুয়া। আপন মনে ব'সে আছেন প্রথম শ্রেণীর কামরায়। তখনকার দিনে ফাস্ট ক্লাসের কামরায় সাহেব-সুবোরাই যাতায়াত করতো। একটা বাঙ্গালী সন্ন্যাসীকে কামরায় দেখে সাহেবদের খুব ভাল না লাগারই কথা। হ'লোও তাই—কিছুদূর যেতেই ট্রেনের ঐ কামরায় দু'জন সাহেব উঠলো। তারা উঠেই গেরুয়া পরা সন্ন্যাসীকে দেখে চটে যান। ইংরাজীতে নিজেদের মধ্যে সন্ন্যাসীকে উদ্দেশ্য ক'রে গাল-মন্দ ক'রতে থাকে। এইরূপ কাণ্ড কয়েকটা স্টেশনে হবার পর স্বামিজী ইংরাজীতেই ওদের কথার প্রতিবাদ ক'রে হাতের মুঠো বাগিয়ে বলেন "যদি আর একবার ঐরূপ কথা শুনি তা'হলে বুঝতেই পারছো।" যখন বুঝতে পারলো বাঙ্গালী সন্ন্যাসীও প্রথম শ্রেণীর যাত্রী এবং ছাড়বার পাত্র নন, তখম ওরা চুপ্‌চাপ হ'য়ে গেলো।

বক্সিং-এর খেলাটা তিনি বড় হয়েও অভ্যাস করতেন। সে বিবরণ তাঁর গুরুভাইদের কথায় জানা যায়। এদের মধ্যে কেউ কেউ তাই তাঁকে বলতেন—"পালোয়ান স্বামী"।

নরেন্দ্রনাথের আরও একটি শখ ছিল গাদাবন্দুক নিয়ে খেলা। মার্বেলের টিপ মারবার মতই গাদাবন্দুকের খেলায়ও অন্যান্য ছেলেদের চেয়ে নরেন্দ্রনাথ কম পটু ছিল না। সন্ন্যাসী হ'য়েও শিকার করবার জন্য দরকার হলে নরেন্দ্রনাথ বন্দুকও ধরেছে। সন্ন্যাসী নরেন্দ্রনাথ মাদ্রাজে বেড়াতে গেছেন। সেখানে হরিণ শিকারের জন্য বন্ধুবান্ধবের একদল যাচ্ছে শুনে তিনিও বললেন—"আমিও শিকারে যাব"।

সন্ন্যাসী শিকারে যাবে!—সবাই আশ্চর্য! নরেন্দ্রনাথ বললেন "আমি ম্যাদাটে সন্ন্যাসী নই!"

শিকারে যেয়ে তিনি বন্দুকের ঘোড়াটা পাকা শিকারীর মতই টিপে গুলি ছুঁড়লেন। সেদিন একটি হরিণ শিকার ক'রে তবে বাড়ী ফিরলেন। এক মাদ্রাজী শিষ্য তাঁর বন্দুক ছোঁড়ার কায়দা দেখে বলেছিলেন—"Swarmiji is a dead shot"।

দরাজদিলের দুরন্ত বালক বিরেশ্বরের প্রাণে সব সময়েই আনন্দের জোয়ার লেগেই থাকতো। তাই বড় হয়েও বীরেশ্বর গঙ্গায় যেমন সাঁতার কেটে দক্ষিণেশ্বরে যেয়ে হাজির হ'য়েছিল, আবার ইংলণ্ড-আমেরিকাতেও সমুদ্রস্নানের সময় বালকের মতোই মেতে উঠতেন। সেখানে যেয়েও তিনি প্রতিদিন ডন-বৈঠক ক'রে আবার সাঁতার অভ্যাস করতেন সমুদ্রের জলে।

বিলেতে থাকবার সময় সেখানকার খেলা-ধূলায়ও তখন সন্ন্যাসী হলেও সে মেতে উঠেছিলো। যেমন বিলেতের মাঠে গল্‌ফ খেলা, বরফের উপরে ছুটে চলার স্কেটিং খেলা, এমন কি বিলেতের পুরুষালী নাচের মহড়া পর্যন্ত দিয়ে সব সময়ে আনন্দে থাকতো।

পর্বতে ওঠবার ঝোঁকটা তার বরাবরই ছিল। আলমোড়ায় শ্রীরামকৃষ্ণ মঠের নির্জন কেন্দ্র স্থাপন তাঁরই চেষ্টায় হয়। পর্বত আর সমুদ্রকে দেখলে মনটাও তাদের মতই মস্ত বড় আর উদার হয়। তাই বীরেশ্বরেরও এ তুটোর দিকেই ঝোঁক ছিল খুব বেশী।

বীরেশ্বরের ছোট বয়স থেকেই যাত্রা করা বা গানেরও পুরোদমের শখ ছিল, যেমন ছিল তার গুরুদেব ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের। কলেজে পড়ার সময় যখন কেশব সেনের দলে "ইয়ং বেঙ্গল"-দের সঙ্গে নরেন্দ্রনাথ যোগ দিয়েছে তখন কেশব সেন মশায়ের বাড়ীতে ( "কমল কুটীর"— এখন আপার সার্কুলার রোড বা আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রোডের উপর— শিয়ালদহ এলেকায় ভিক্টোরিয়া কলেজ যেখানে হয়েছে ) নব-বৃন্দাবন নাটকে যোগী সেজে কী সুন্দর নাটকই না করেছিল! এই নাটকের নাকি টিকিট বিক্রী করেছিলেন ভবানী বন্দ্যোপাধ্যায়। তিনি নরেন্দ্রনাথের কলেজের সহপাঠী ছিলেন, পরে তাঁর নাম হয় ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায়। ছেলেবেলার এই বাতিক সন্ন্যাসী হ'য়েও তাঁর যায় নি। বেলুড় মঠে তিনি একবার কী কাণ্ডই না করেছিলেন!—তা বলছি শোন।

ছাত্রজীবনে থিয়েটার করতে গিয়ে নরেন্দ্রনাথ একবার এমন একটা হাঙ্গামা বাধিয়ে দিয়েছিল যা থেকে বোঝা যায় থিয়েটার তার কত প্রিয় ছিল। বাড়ীর কাছেই সেদিন কোন এক ভদ্রলোকের বাড়ীর উঠানে থিয়েটার হচ্ছে। লোকজন প্রচুর এসেছে। সবাই যখন থিয়েটারে মেতে উঠেছে—তখন একটা গোলমাল বাধিয়ে দিলে একটা আদালতের পেয়াদা। থিয়েটারে যে লোকটি হিরোর ( প্রধান অভিনেতার ) পার্ট করতে নেমেছে কী কারণে তাকে ধরবার জন্য আদালতের সমন জারী করতে এক পেয়াদা সেই স্টেজের মধ্যেই এসে হাজির। কারণ ওকে বাড়ী পায় নি। পেয়াদা যেই অভিনেতাটিকে স্টেজের মধ্যে যেতে দেখেছে অমনি তাকে খপ্ ক'রে

হাতে ধ'রে ফেলে টানতে সুরু করে দিলে। স্টেজের মধ্যে নায়কের অপমান—তার ওপর রসভঙ্গ—হঠাৎ এইসব কাণ্ডকারখানা দেখে স্টেজের মধ্যে ভীড় জমে গেল। সভার মধ্যে মহা গোলমাল বেধে থিয়েটার পণ্ড হয় আর কি! এমন সময় সবাইকে ঠেলে নরেন্দ্রনাথ স্টেজের মধ্যে ঢুকে চীৎকার ক'রে সেই পেয়াদাটাকে বললো—"যাও, স্টেজ থেকে বেরিয়ে যাও। যতক্ষণ না 'প্লে' শেষ হ'বে ততক্ষণ বাইরে দাঁড়িয়ে থাকগে।"

নরেন্দ্রনাথ যেই সাহস ক'রে এই কথা বলতে পেরেছে অমনি চারদিক থেকে রব উঠলো—"বেরিয়ে যাও, শীগ্‌গির বেরিয়ে যাও—"। পেয়াদা বেচারী অত লোকের ধমকে থতমত খেয়ে স্টেজ ছেড়ে দিতে বাধ্য হ'লো। বন্ধুবান্ধবের দল নরেন্দ্রনাথকে কাঁধের ওপরে তুলে নিয়ে নাচতে সুরু করলো। "তুই না হলে আজ সবই পণ্ড হ'তো।" আবার নাটক সুরু হ'লে দর্শকেরা সবাই খুশী। নরেন্দ্রনাথ এইরূপ থিয়েটার-বাড়ীতে মাঝে মাঝেই করতো। আবার তার জন্য টিকিট ক'রে বাড়ী বাড়ী যেয়ে বিক্রী করে খরচাও তুলতো।

১৮৯৮ সালের ফেব্রুয়ারী মাস। শ্রীরামকৃষ্ণের জন্মোৎসব নীলাম্বর বাবুর বাগান-বাড়ীর পুরোনো বেলুড় মঠে সেদিন হচ্ছে। ঠাকুর-পূজা হ'য়ে যাবার পর নরেন্দ্রনাথ অর্থাৎ স্বামী বিবেকানন্দ গুরুভাইদের সঙ্গে বসেছেন।

তিনি সেদিন যারা ব্রাহ্মণ নয়, এমন জনকয়েক ভক্তকে বেছে বেছে নিজ হাতে গলায় পৈতে পরিয়ে দিয়ে ব্রাহ্মণ পদবীতে উঠিয়ে দেবেন। কারণ তিনি বলতেন, "ছোট, যারা তাদের শিক্ষা-দীক্ষা দিয়ে ক্রমে ব্রাহ্মণ-পদবীতে উঁচুতে তুলে আনতে হবে। ছোঁব না, ছোঁব না ব'লে এদের আমরাই হীন করে ফেলেছি—এদের তুলতে হবে, বলতে হবে তোরাও আমাদের মত মানুষ"।

পৈতা-দান পর্ব শেষ হ'লে শ্রীরামকৃষ্ণ দেবের পরম ভক্ত নাট্যকার গিরিশচন্দ্র ঘোষ মশায় এসে উপস্থিত হ'লেন। তখন স্বামীজীর আদেশে গানের আসর বসলো। তারপর মঠের সন্ন্যাসীরা তাঁকে (স্বামীজীকে) ধ'রে বসলেন যে, আজ তাঁকে যোগীর সাজে সাজতে হবে। তাই হ'লো—কানে শঙ্খের কুণ্ডল, সর্বাঙ্গে সাদা বিভূতি (ছাই), মাথায় শিবের মত জটা, বাঁ হাতে ত্রিশূল, গলায় রুদ্রাক্ষের মালা প'রে তিনি যখন স্তব আরম্ভ করলেন, তখন মঠে তাকে, দেখবার জন্য হুলস্থুল প'ড়ে গেল।

কিছুদিন পরে স্বামীজী আবার গিরিশ ঘোষ মশায়কে নিজের যোগীর সাজ পড়িয়ে দিয়ে, গায়ে বিভূতি (ছাই) মাখিয়ে বললেন, "ঠাকুর বলতেন ইনি ভৈরবের অবতার—আমাদের সাথে এর কোন প্রভেদ নেই।" তখন সবাই স্বামীজী আর গিরিশ ঘোষ মশায়কে নিয়ে খুব আনন্দ করলেন। সেদিন মঠে গানের আসর ভারি মজার আসরে জমে উঠলো।

নরেন্দ্রনাথের গানের গলা ছোটবেলা থেকেই অতি মধুর ছিল। তাঁর বাবা বিশ্বনাথ দত্ত মশায়ও গান গাইতে পারতেন। তখনকার দিনে বাংলাদেশে নিধু গুপ্ত নামে একজন কবি ছিলেন। তাঁর গান তখন খুব চলতি। বিশ্বনাথ দত্ত নিধুবাবুর গান গাইতেন। নরেন্দ্রনাথের মা ভুবনেশ্বরী দেবী তখনকার দিনের ভক্তিমূলক গানগুলি মধুর কণ্ঠে গাইতেন—একথা তাঁর ছোট দুই ছেলে মহেন্দ্রনাথ ও ভুপেন্দ্রনাথের লেখা নানা কাহিনী থেকেই জানা যায়।

নরেন্দ্রনাথের গলায় সুমিষ্ট গান শুনে বিশ্বনাথ দত্ত তার বয়স বাড়বার সঙ্গে সঙ্গেই তাকে ওস্তাদের কাছে পাঠালেন গান ভালভাবে শিখতে। ওস্তাদ আমেদ খাঁর শিষ্য বেণী গুপ্তের কাছেই নরেন্দ্রনাথ হিন্দুস্থানী সঙ্গীত প্রথম শিখতে আরম্ভ করেন। তখন সে প্রবেশিকা

পরীক্ষার জন্য তৈরী হ'চ্ছে। তারপর তিনি আদি ব্রাহ্মসমাজের পাখোয়াজ-বাদক কাশী ঘোষালের কাছে গান ও তবলা বাজানো দুটোই শেখেন। পরে আমেদ খাঁ এবং উজীর খাঁর কাছেও নরেন্দ্রনাথের গানের পাঠ চলে। কাশী ঘোষালের কাছে সে তবলার সঙ্গত করতো। পরে কানাই চেড়ী ও জগন্নাথ মিশ্র নামে দুইজন ওস্তাদের কাছে মৃদঙ্গ ও পাখোয়াজ শিক্ষা করে। পিতার মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত নরেন্দ্রনাথ ওস্তাদের কাছে গান ছাড়াও সেতার এবং এসরাজ বাজাতেও শিখেছিলো। পরে বড় হ'য়ে নরেন্দ্রনাথ গান রচনা করতো এবং গানের বিষয়ে বইও লিখেছিলো। সুমধুর গান গেয়েই সে পাড়াপ্রতিবেশীদের সকলের ভালবাসা পেয়েছিলো। নরেন্দ্রনাথের বাল্যবন্ধু ডাঃ মনোমোহন গাঙ্গুলী তাঁর লেখা বিবেকানন্দের জীবনীতে লিখেছেন যে নরেন্দ্রনাথ গানের বিষয়ে যে বইটি লিখেছিলেন তা ছাপিয়েছিলেন বটতলার বৈষ্ণবচরণ বসাক ও উপেন্দ্রনাথ মুখার্জী। উপেন্দ্রনাথ মুখার্জী "বসুমতী পত্রিকা" ও "বসুমতী সাহিত্য মন্দির"-এর প্রতিষ্ঠাতা। তিনি নরেন্দ্রনাথের বাল্যবন্ধু এবং শ্রীরামকৃষ্ণের গৃহী শিষ্যদের মধ্যে একজন প্রধান ভক্ত ছিলেন।

ডাঃ মনোমোহন গাঙ্গুলী বলেছেন যে, স্বামীজীকে তিনি সেই সময়েই নিজে পাখোয়াজ বাজিয়ে বৈঠকে গান গাইতে শুনেছেন। নরেন্দ্রনাথের এই গানের কথা তাঁর বাল্যবন্ধু সেণ্ট্ জেভিয়ার্স কলেজের ছাত্র শরৎচন্দ্র চক্রবর্তী ( পরে স্বামী সারদানন্দ ) মশায়ের বাল্যকথা থেকেও জানা যায়। তাঁর সঙ্গে নরেন্দ্রনাথের প্রথম দেখা হওয়ার কাহিনী তিনি এইভাবে বর্ণনা করেছেন। একদিন সিমলা পাড়ার ধীরেন পালের বৈঠকখানায় নরেনের সঙ্গে প্রথম সাক্ষাৎ। ঘটনাটি হয়েছিল এইরূপ; "অল্পক্ষণ পরেই এক যুবক কক্ষমধ্যে উপস্থিত হইল এবং আসিয়াই তাকিয়া টানিয়া লইয়া ঠেস্ দিয়া

অর্ধশয়ান অবস্থায় গুণ গুণ করিয়া একটি হিন্দী খেয়াল ধরিল। ঘরে যে একজন বসিয়া আছে সেদিকে ভ্রূক্ষেপমাত্রও করিল না। দিব্যি টেরিকাটা ফিটফাট চেহারা, কিন্তু দৃষ্টি উন্মনা।”

পরে আর একদিন নরেন্দ্রনাথের সঙ্গে দেখা করবার জন্য শরৎচন্দ্র সিমলা পাড়ায় আবার এলেন। রামতনু বসু লেনের মাতামহীর বাড়ীর উপরের তলায় একটি ঘরে থেকে নরেন্দ্রনাথ পড়াশুনা করে। কারণ এখানে ছেলেপুলে নেই—তাই নির্জন। বাড়ীর দোতলায় একটা ছোট ঘরে মাত্র একটি ছেঁড়া মাদুর পাতা। তার চারদিকে কেবল বই আর বই—ঘরের এক কোণে একটি তানপুরা এবং একজোড়া বায়া ও তবলা।

সেদিন শরৎচন্দ্র দেখা করতে এসে দেখে নরেন্দ্রনাথ বইয়ের মধ্যে পড়ায় ডুবে রয়েছে। নরেন সাড়া দেয় না দেখে শরৎচন্দ্র বললেন, “একটু রাখ্। একটা গান গা না শুনি।” নরেন্দ্রনাথ হেসে বইটা এক পাশে ঠেলে দিয়ে উত্তর করলো—“তা বেশ! তবে তুই বায়াটা নে।”

শরৎচন্দ্র উত্তর করলো—“ভাই, বাড়ীতে গান-বাজনা করবার কি উপায় আছে? গান একটু আধটু গাইতে পারি—কিন্তু তবলা-বায়া কদাচ নয়।”

নরেন্দ্রনাথ উৎসাহের সঙ্গে উত্তর করলো—“আরে ভয় কি! ওটা এমন কিছু কঠিন কাজ নয়। আয়, তোকে তবলার কয়েকটা ঠেকা শিখিয়ে দিচ্ছি।”

শরৎচন্দ্রকে সেদিন তবলার কয়েকটা ঠেকা শিখিয়ে দিয়েছিল। পরে শরৎচন্দ্র বলেছেন, “নরেনের শিখাবার কায়দা অতি চমৎকার। অল্প সময়ের মধ্যে সে আমাকে তবলার সব ঠেকাগুলি শিখিয়ে দিয়েছিল।”

স্বামিজীর ছোট ভাই মহেন্দ্রনাথ দত্ত বলেছেন—"কলকাতায় যারা বিশিষ্ট ধ্রুপদ-গায়ক, স্বামিজী তাহাদের মধ্যেও একজন বিশিষ্ট গায়ক বলিয়া পরিচিত।·······স্বামিজী একজন বড় গাইয়ে এবং গাইয়ে হিসেবে তাঁহার কলকাতায় বেশ নাম আছে।"

নরেন্দ্রনাথ ১৮৯০ খৃষ্টাব্দে গৃহ ত্যাগ করে যখন ভারতবর্ষের নানা জায়গায় ঘুরে বেড়াচ্ছেন তখনও এই অভ্যাসটি ছাড়েননি। ঘুরতে ঘুরতে রাজপুতানার ছোট্ট একটি রাজ্য খেতড়ীতে এসে সেখানকার রাজা অজিত সিংহের প্রাসাদে অতিথি হলেন নরেন্দ্রনাথ—তখনও বিবেকানন্দ নয়। রাজা অজিত সিংহ তার সিংহের মত চেহারা আর শংকরাচার্যের মত শাস্ত্রজ্ঞান দেখে এতই তাঁকে আপন জন ব'লে ভাবলেন যে পরে তাঁর গুরুই হ'লেন এই পরিব্রাজক নরেন্দ্রনাথ। আর তিনিই তাঁর গুরুর নাম দিলেন "স্বামী বিবেকানন্দ"—১৮৯৩ খৃষ্টাব্দে চিকাগোতে যাবার আগে। রাজা অজিত সিংহের খেতড়ীর রাজপ্রাসাদে নরেন্দ্রনাথ সন্ন্যাসিরূপে যখন আছেন, তখন গুরু নরেন্দ্রনাথ, শুধু যে শিষ্যকে ধর্মের কঠিন সত্য বুঝিয়ে দিয়েছেন তাই নয়, তিনি রাজার সাথে মাঝে মাঝেই গানের আসরে আনন্দে যোগ দিয়েছেন। এখানেই তাঁর শিষ্য অজিত সিংহের সঙ্গে, গান গাইতেও নরেন্দ্রনাথকে দেখা যায়। যখন রাজা নিজে গান গাইতেন, নরেন্দ্রনাথ তখন হারমোনিয়াম বাজাতেন, আবার যখন নরেন্দ্রনাথ গান গাইতেন, তখন রাজা নিজে হারমোনিয়ম বা বীণা বাজাতেন। এই রাজার সভা-গায়ক ছিলেন ওস্তাদ মুসারফ খাঁ। তিনি যেমন খুব বড় গায়ক ছিলেন, তেমনি সুন্দর বীণাও বাজাতে পারতেন। নরেন্দ্রনাথ কত বড় গাইয়ে হ'লে এত বড় ওস্তাদের কাছে গানের আসরে বসতেন তা সহজেই বোঝা যায়। ঐ ওস্তাদ মুসারফ খাঁকে পণ্ডিত জহরলাল নেহরুর বাবা পণ্ডিত মতিলাল নেহরু প্যারিস শহরে গানের জলসায়

যোগদানের জন্য ভারতবর্ষের প্রতিনিধি ক'রে এই সময় পাঠিয়েছিলেন শোনা যায়। সন্ন্যাসী হবার আগে নরেন্দ্রনাথ যখন কলেজের ছাত্র, তখন থেকেই সে ব্রাহ্মসমাজে যাতায়াত করে। সে প্রায় ১৮৮৩-৮৪ খৃষ্টাব্দের কথা। সেখানে নরেন্দ্রনাথ ব্রাহ্ম-সঙ্গীত গাইতেন। তার গলার মিষ্ট স্বর তাকে সবারই প্রিয় ক'রে তোলে। শোনা যায় এই গানের আসরেই রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে যুবক নরেন্দ্রনাথের প্রথম পরিচয় হ'য়েছিল। রবীন্দ্রনাথ এখানে যাদের নিয়ে গানের দল ক'রেছিলেন নরেন্দ্রনাথও তাদের একজন ছিলেন বলে কেউ কেউ ব'লে থাকেন। রবীন্দ্রনাথ তখনও বিশ্বকবি হননি, আর নরেন্দ্রনাথও তখন বিশ্ববিজয়ী স্বামী বিবেকানন্দ হননি।

নরেন্দ্রনাথ ব্রাহ্ম-সমাজে যে সকল গান গাইতেন তার মধ্যে একটি এখন পর্যন্ত সকলের মুখে মুখে ফেরে। সেটি হলো—

"মন চল নিজ নিকেতন।
সংসার বিদেশে বিদেশীর বেশে
ভ্রম কেন অকারণে।"

পরে নরেন্দ্রনাথ বড় হয়ে নিজেও বাংলা ও সংস্কৃত ভাষায় গান ও স্তব রচনা করেন। আবার নিজেই তাতে সুরও দিয়েছিলেন। তার বাংলা ভাষায় শ্রীরামকৃষ্ণ প্রার্থনা সঙ্গীত প্রাণ-মাতানো।

"খণ্ডন ভব বন্ধন জগ বন্দন
বন্দি তোমায়
নিরঞ্জন নবরূপধর নির্গুণ গুণময়।"

ধ্রুপদী ছন্দে লেখা এই গানের সুর মনকে উদাস ক'রে দেয়। তিনি নিজে তানপুরা নিয়ে যখন গান গাইতেন, সে দৃশ্য আমরা আজ কেবল ভাবতে পারি। আজও বেলুড় মঠে তাঁর শোবার ঘরটিতে তানপুরাটি অতি যত্ন ক'রে রেখে দেওয়া আছে। আর গানের যে বইটি নরেন্দ্রনাথ লিখে ছাপিয়েছিলেন সেই পুরোনো বইটিও বেলুড় মঠের লাইব্রেরীতে যত্ন ক'রে রেখে দেওয়া হয়েছে।

# বিদ্যার্থী বিবেকানন্দ



নরেন্দ্রনাথের খেলাধূলার বিষয় আরও একটা বড় কথা হ'লো দেশী লাঠি খেলায় তার শিক্ষা। নরেন্দ্রনাথ তখন মেট্রোপলিটন স্কুলের ছাত্র। ছেলেবেলা থেকেই লাঠি খেলার দিকে তার খুব ঝোঁক ছিল। নরেন্দ্রনাথের লাঠি খেলার শিক্ষা হয় এক মুসলমান ওস্তাদের কাছে। তখন তার বয়স মাত্র দশ বছর। একবার এক জিমনাস্টিকের আসরে লাঠি খেলায় সে তার চেয়েও বড় একজন লাঠিয়ালকে চ্যালেঞ্জ করে। সকলে অবাক্! কিন্তু নরেন্দ্রনাথ এমন সুন্দরভাবে খেলার কায়দা আয়ত্ত করেছিলো যে, তাকে হারিয়ে দিয়ে ঐ বালকই প্রথম পুরস্কার লাভ করে। তাতে স্কুলে নরেন্দ্রনাথের খুব নাম হয়েছিল। সন্ন্যাসী নরেন্দ্রনাথও নিজের সুন্দর সুঠাম শরীরের সঙ্গে মানায় এমন একটি পাকা মজবুত লাঠি সর্বদাই ব্যবহার করতেন। তার পরিব্রাজক ছবিটিতে তোমরা এই লাঠিটি নিশ্চয়ই দেখে থাকবে। ঐ লাঠি, একটি কমণ্ডলু এবং দুটি গেরুয়া বস্ত্র মাত্র সম্বল ক'রে তিনি একা একা সারাটা ভারতবর্ষ ৬ বছর ধ'রে (১৮৮৭-৯৩) ঘুরে বেড়িয়েছেন—দেশের ইতিহাস, ভূগোল,

দর্শন এবং তার আদর্শকে জানবার জন্য—গোটা দেশের মানুষকে দেখার জন্য। তাদের সুখদুঃখ ও আশা-আকাঙ্ক্ষাকে বোঝবার জন্য।

বীরেশ্বরের ছোটবেলা থেকেই পাড়া-প্রতিবেশী সকলের সঙ্গে ভাব করবার একটা বিশেষ সদ্‌গুণ ছিল,—কাউকে দিদি, কাউকে মাসী, কাউকে পিসি আবার কাউকে দাদু, দিদিমা বলে ডেকে আপন ক'রে নিতে সে ছিল ওস্তাদ। সেই কারণে সবাই বীরেশ্বরকে ভালবাসতো, আদর করতো। একটা ঘটনার কথা তোমাদের বলছি।

ছোটবেলার বন্ধু উপেন্দ্রনাথের সঙ্গে নরেন্দ্রনাথের ভারি ভাব। তার ভাবি স্ত্রী বসুমতী দেবীও ঐ পাড়ারই মেয়ে। ছোটবেলায় ফুল তুলতে ভোর হলেই সিমলা পাড়ায় বিশ্বনাথ দত্তদের বাড়ীতে ওরা প্রতিদিন যেতো। স্থলপদ্ম আরও কত ফুল বাগান ভ'রে ফুটে থাকতো। বীরেশ্বরের ডাগর ডাগর চোখদুটিও ছিল বাগানের সদ্য-ফোটা স্থলপদ্মের বড় বড় পাপড়ির মতোই সুন্দর। বসুমতী দেবীর এক কাহিনী থেকে জানা যায় যে, বালক উপেন্দ্রনাথ ও বসুমতী দেবী একসঙ্গে ফুল তুলতে যেতো। নরেন্দ্রনাথ ওদের ফুল দিয়ে বসুমতী দেবীকে ঠাট্টা করে বলতো, "যা তুই কালো মেয়ে, অত সুন্দর ফুল নিয়ে কি করবি ?"

পরে যখন সত্যিই উপেন্দ্রনাথের সঙ্গে ঐ মেয়েটির বিয়ে হয়, তখন একদিন নরেন্দ্রনাথ বন্ধুর বাড়ীতে গিয়ে বৌ দেখতে হাজির। বৌ-য়ের ঘোমটা নিজ হাতে খুলে, খোঁপায় নাড়া দিয়ে বলে, "আরে এ-যে সেই কালো মেয়েটিই উপেনের বাড়ীতে এলো।"

নরেন্দ্রনাথের বাল্যবন্ধু উপেন্দ্রনাথ বন্ধুকে খাবার দিয়ে বৌকে বলে, "যাও, নরেনের জন্য সুপুরী এনে দাও।"

মেয়েটি অভিমানে বলে—'আমি পারবো না। ও আমায় কালো মেয়ে কেন বল্‌লে ?" ( ১ )

---

১। মাসিক বসুমতী, বৈশাখ—১৩৬০ "বিবেকানন্দ ও বসুমতী" প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য।

নরেন্দ্রনাথের এইভাব দেখে সমবয়সী বন্ধু ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় (ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায়) তাঁর এক স্মৃতিকথায় লিখেছেন—"নরেন্দ্র ছেলেবয়সে খুব আমুদে ছিলো। তাস খেলতে, ইয়ারকি দিতে, তামাক ফুঁকতে, গান-বাজনা করতে এমন আর জুটি ছিল না। কিন্তু আমাদের মধ্যে কোন ইতরামি বা কদর্যতা দেখা যেত না। প্রাণটা খোলা গড়ের মাঠ, যত মাড়িয়ে যেতে পার মাড়িয়ে যাও। এই যৌবনের আমোদ-প্রমোদের সময়ই তাঁহার এক স্পর্শ-মণির সঙ্গ লাভ হইল। শ্রীরামকৃষ্ণ সেই স্পর্শমণি।" (২)

এই যোগাযোগের কথা আমরা পরে তোমাদের বলবো।

## বিদ্যালয়ের শেষ পর্ব

নরেন্দ্রনাথ ছিলো "ঠিক সাহেবদের ছেলেদের মত, কর্মক্ষম, চঞ্চল, দৃঢ়প্রতিজ্ঞ এবং দীপ্ত হুতাশনের মত তেজঃপূর্ণ।" নরেন্দ্রনাথের বাল্য-কালের কথা লিখতে গিয়ে একজন ঐরূপ বলেছেন। ঐকথাগুলি কিন্তু একটুও অতিরঞ্জিত নয়। তার বয়স তখন মাত্র ১১।১২ বছর—১৮৭৪-৭৫ খৃষ্টাব্দ হ'বে। ভারতে জাতীয় কংগ্রেস সেবার স্থাপিত হ'তে চলেছে। স্যার সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জী, উমেশচন্দ্র ব্যানার্জী ও মিঃ হিউম্ নামে একজন উদারমনা ইংরেজই একাজে অগ্রণী হলেন। ইংরেজ শাসনকর্তারাও নীরব রইলো না। ভারতের যুবরাজ, অর্থাৎ মহারাণী ভিক্টোরিয়ার পুত্র সপ্তম এডওয়ার্ডকে ভারতবর্ষে আনলেন

( ) মাসিক বসুধারা, বৈশাখ—১৩·০ "বিবেকানন্দ প্রসঙ্গে ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায়" প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য।

খুব জাঁকজমক ক'রে। তার কিছুদিন আগেই কলকাতার বন্দরে ইংরেজদের যুদ্ধ-জাহাজও এসে উপস্থিত হ'লো—যেন ভারতবাসীকে ভয় দেখাবার জন্যই।

নতুন জিনিস যুদ্ধের জাহাজ "ম্যান অব ওয়র" কলকাতার জেটিতে এসে ভিড়েছে। নাম তার 'সিরাসিপ'। ঘোষণা করা হ'ল এই জাহাজের ভিতরটা দেখতে হ'লে চৌরঙ্গীতে বড় সাহেবের অফিস থেকে পাশ নিয়ে যেতে হবে দরখাস্ত ক'রে। নরেন্দ্রনাথের সঙ্গিদল তাদের লীডরকে ধরে বসল, "ভাই জাহাজ দেখতেই হবে। একটা বুদ্ধি কর।"

নরেন্দ্রনাথ একটা দরখাস্ত লিখে চৌরঙ্গীর অফিসে গিয়ে দেখে যে লোকে লোকারণ্য। আর দারোয়ান কেবল বড় বড় লোকদের সাহেবের কামড়ায় যেতে দিচ্ছে। নরেন্দ্রনাথকে দারোয়ান হটিয়ে দিলে। কিন্তু বীরেশ্বর তো হটবার পাত্র নয়।

নরেন্দ্রনাথ দেখে যে সাহেবের ঘরটি ওপরে। সামনের সিঁড়ি দিয়ে দারোয়ান পাশ দিয়ে বড়দের সেখানে ঢুকিয়ে দিচ্ছে। সেখান দিয়ে নরেন্দ্রনাথের যাবার উপায় নেই। বয়সের বাধা। কিন্তু নরেন্দ্রনাথ বাধাকে মানবার ছেলে নয়। তাকে উপরে সাহেবের কাছে যে কোন ভাবে হোক যেতেই হবে।

ভীড়ের মধ্যে ঘরের এদিক সেদিক ঘুরতে ঘুরতে নরেন্দ্রনাথ দেখে আর একটা লোহার ছোট সিঁড়ি উপরে সাহেবের ঘরে উঠে গিয়েছে। নরেন্দ্রনাথ অপেক্ষায় রইলো, কখন ঐ দারোয়ানটা অন্য দিকে চলে যাবে। সুযোগটা ভিড়ের মধ্যে আসতে বেশী দেরি হ'লো না। যেই দারোয়ানের সরে যাওয়া অমনি হনুমানভক্ত নরেন্দ্রনাথ তিন লাফে ঐ লোহার সিঁড়ি দিয়ে উঠে একেবারে সাহেবের ঘরের মধ্যে গিয়ে হাজির। কিশোর নরেন্দ্রনাথ সাহস ক'রে পকেট

থেকে দরখাস্তখানা বার করে সাহেবের টেবিলের দিকে এগিয়ে আসতেই সাহেব তার দিকে চেয়ে ইংরেজীতে বলে উঠলো—"What do you want my young friend ?" অর্থাৎ "ছোট্ট বন্ধু, তোমার কি চাই ?"

নরেন্দ্রনাথ সোজা দাঁড়িয়ে দরখাস্তটি সাহেবের সামনে টেবিলের ওপর রাখতেই সাহেব ভারি খুশী হয়ে লিখে দিলেন, "মঞ্জুর"। নরেন্দ্রনাথও সাহেবকে ধন্যবাদ জানিয়ে দরখাস্তখানা পকেটে পুরে গট্‌গট্‌ করে সামনের দরজা দিয়ে নেমে আসলো।

নরেন্দ্রনাথকে দেখে দারোয়ান রেগে অস্থির। বললো, "তুম ক্যায়সে উপরমে গিয়া থা ?"

নরেন্দ্রনাথও ভারিক্কী চালে উত্তর করলো, "ম্যয় জাদু জানতা হ্যায় " এই কথা বলেই সেখান থেকে দে ছুট। পাড়ায় এসে হাজির হ'লে বন্ধুরা মহা খুশী। এই না হ'লে লীডর !

মেট্রোপলিটন স্কুলে যখন নবম শ্রেণীর ছাত্র তখন ছাত্র হিসেবে নরেন্দ্রনাথের বেশ সুনাম হ'লো। শুধু ক্লাসের পড়ার জন্যই নয়—এই অল্পবয়সেই সে মুগ্ধবোধ ব্যাকরণ মুখস্থ ক'রে ফেলেছে; এমন কি সংস্কৃত ভাষায় লেখার অভ্যাস চলেছে। নতুন ভাষা শেখবার ঝোঁক নরেন্দ্রনাথের চিরদিন ছিল।, বাল্যকাল থেকেই ইংরেজী, বাংলা ও সংস্কৃত ভাষা শেখা আরম্ভ হয়। বড় হয়ে ইংরেজী ভাষা ইংরেজ শিক্ষকের কাছেই প্রেসিডেন্সী কলেজ ও জেনারেল অ্যাসেমব্লীজ ইন্‌স্টিটিউশনে ( বর্তমান স্কটিশ চার্চ কলেজ ) পড়েছিলেন। আর সংস্কৃত পাঠের হাতেখড়ি ডাঃ রামচন্দ্র দত্তের কাছে হ'লেও পরে যেখানেই ভাল পণ্ডিত পেয়েছে সেখানেই নরেন্দ্রনাথ এই ভাষাটি শিখেছে। যখন পরিব্রাজকরূপে খেতড়ীর রাজা অজিত সিংহের অতিথি ( ১৮৯১ খৃঃ ) তখন নরেন্দ্রনাথের বয়স প্রায় ২৭।২৮ বছর। তখন খেতড়ির রাজ-পণ্ডিত নারায়ণ দাসজীর কাছে নরেন্দ্রনাথ পাণিনি ব্যাকরণ

পড়ছে দেখতে পাই। তারপরও জয়পুর, গুজরাট, কাশ্মীর, মাদ্রাজ যখন যেখানে গিয়েছেন সেখানেই সংস্কৃত পণ্ডিতদের কাছ থেকে ভারতের এই প্রাচীন ভাষাটি শিখেছে। নরেন্দ্রনাথ পরে সংস্কৃত ভাষায় শ্রীরামকৃষ্ণদেবের যে স্তব রচনা করেছে তা এখন শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের সর্বত্র গাওয়া হয়। সন্ধ্যাবেলা বেলুড় মঠে বা রামকৃষ্ণ মিশনের যে কোন কেন্দ্রে গেলেই দেখতে পাবে প্রতিদিন এই স্তবটি সুন্দর ক'রে সকলে একসঙ্গে গেয়ে থাকেন। এই স্তবের সুর ও তাল সবই তার দেওয়া। তাছাড়াও বেদ, বেদান্ত, সাহিত্য, দর্শন পড়বার জন্য ভারতবর্ষের এই প্রাচীন ভাষা বেশ ভালোভাবেই নরেন্দ্রনাথ শিখেছিলো। মাদ্রাজে একবার সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিতদের সঙ্গে সংস্কৃতে তর্ক ক'রে সে সকলকে অবাক্ করে দিয়েছিলো। ভারত পরিভ্রমণ করবার সময় বিখ্যাত সংস্কৃত পণ্ডিত রাজা শংকর পাণ্ডুরং-কে বেদ অনুবাদের কাজেও সহায়তা করেছে।

এই সময় নরেন্দ্রনাথের আর একটা দিকেও বেশ বুদ্ধি খেলতে থাকে। বাড়ীতে সঙ্গীদের নিয়ে যেমন নরেন্দ্রনাথের থিয়েটার-যাত্রার আসর জমতো, স্কুলেও তেমনি বিতর্ক-সভার আসরে নরেন্দ্রনাথই প্রধান পাণ্ডা হ'য়ে ওঠে। এই বিতর্ক-সভায় নরেন্দ্রনাথ কখনও বাংলা, কখনো-বা ইংরেজী ভাষায় বক্তৃতা দিতেন। তার কথা বলবার ধরন এবং ভাষার উপর দখল দেখে মাস্টার মশায়গণ খুবই সন্তুষ্ট হন।

একদিন একজন মাস্টারমশায় স্কুল ছেড়ে চলে যাবেন। ছাত্রদের পক্ষ থেকে তাঁকে একটি বিদায়-সভার অভিনন্দন দেবার জন্য আয়োজন করা হ'লো। সেদিন সভাপতির আসন গ্রহণ করেছিলেন তখনকার দিনের বাংলার নেতা স্যার সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জী মশায়। ঐ সভায় ছাত্রদের পক্ষ থেকে বক্তৃতা দেবার ভার পড়ে নরেন্দ্রনাথের উপর।

## বিদ্যার্থী বিবেকানন্দ

কিশোর নরেন্দ্রনাথের ইংরেজী বক্তৃতা শুনে স্যার সুরেন্দ্রনাথ আশ্চর্য হয়ে গিয়েছিলেন। তোমরা জান, বড় হয়ে নরেন্দ্রনাথই সন্ন্যাসী বিবেকান্দরূপে চিকাগো শহরে বিশ্বধর্মসভায় ১৮৯৩ খৃষ্টাব্দে হিন্দুধর্মের উদার মনোভাব ব্যাখ্যা ক'রে ইংরেজী ভাষায় চমৎকার এক বক্তৃতা করে বিশ্ববিখ্যাত হয়। তার বক্তৃতা শুনে সেই ধর্মসভার সভাপতি ড. ব্যারোজ বলেছিলেন যে, 'আজ আমরা বুঝতে পারলাম যে কেন ভারতবর্ষ সকল ধর্মভাবের জন্মদাত্রী।' আর একজন বলেছিলেন, সে যেন একটি 'সাইক্লোন'। ভাব ও ভাষার শক্তিদ্বারা প্রবল বেগে শ্রোতার মনকে উড়িয়ে নিয়ে যাবার ক্ষমতা ছিল তার অসীম।

এই বক্তা বিবেকানন্দের বক্তৃতার প্রথম শিক্ষা আরম্ভ হয়েছিল ঐ বিদ্যালয়ের পাঠাভ্যাসের সময় থেকেই।

নরেন্দ্রনাথের পাঠের অভ্যাস সকলের মতো ছিল না। সে কখনও অতি ভাল ছেলেটির মত সবসময়ে বই নিয়ে বসে থাকতে পারতো না। ছোটবেলায় যেমন গুরুমশায়ের মুখে পাঠ শুনে শুনেই তার পড়া আয়ত্ত হ'য়ে যেতো, বিদ্যালয়ের পাঠাভ্যাসেও নরেন্দ্রনাথ ছিল তেমনি একটু ভিন্ন রকমের। সুবোধ বালকের মত পড়তে নরেন্দ্রনাথের চঞ্চল প্রকৃতি চাইতো না। বিশ্বনাথ দত্ত পুত্রের এই চঞ্চল স্বভাব লক্ষ্য ক'রে একজন গৃহশিক্ষক নিযুক্ত করলেন।

নরেন্দ্রনাথের পাঠাভ্যাসের কথা সম্বন্ধে তার ভাই মহেন্দ্রনাথ লিখেছেন যে নরেন্দ্রনাথ সকালবেলা খানিকক্ষণ এবং সন্ধ্যার পর খানিকক্ষণ পড়াশুনা করতো। বাকী সময় খেলাধুলা ও দুষ্টুমি ক'রে কাটাতো। ছুটি হ'লে কখনো বা কপাটি খেলায় মেতে উঠতো। সারা বছর মন দিয়ে পড়ার অভ্যাস তখনও হয়নি। তবে পরীক্ষার আগে দু'একমাস খুব চেপে পড়তো।

দুষ্টুমি বা খেলাধুলা ক'রে কাটালে কী হবে, নরেন্দ্রনাথ ছিল শ্রুতিধর। একবার যা শুনতো তাই তার মনে বসে যেতো—তাই পরীক্ষায় বরাবরই খুব ভাল ফল করতো। নরেন্দ্রনাথ ছাত্রজীবনে ইংরেজী, সংস্কৃত, বাংলা এবং ইতিহাস খুব মন দিয়ে পড়তো। কিন্তু অঙ্কে তত ভাল ছিল না। ওটা তার ভাল লাগতো না। কিন্তু বড় হ'য়ে নরেন্দ্রনাথ উচ্চতর অঙ্কশাস্ত্রের একজন কৃতী ছাত্র ওঠে। তখন তার কাছে উচ্চতর গণিতও দর্শন বিদ্যার মতোই প্রিয় হ'য়ে উঠেছিল। কারণ দুটোই মানুষের মনকে আপন চিন্তায় একটা উঁচু ভাবের জগতে নিয়ে যায়। আর নরেন্দ্রনাথের চরিত্রে এই ভাবের দিকটাই বরাবর প্রবল ছিল।

নরেন্দ্রনাথ তার নিজের ছাত্রজীবনের পাঠাভ্যাসের সম্বন্ধে বড় হ'য়ে পরে বলেছে, "শিক্ষকমশায় বাড়ী এলে ইংরেজী-বাংলা পাঠ্যপুস্তকগুলি তাঁর কাছে এনে কোন্ পর্যন্ত পড়া তা জেনে নিতুম। তারপর একবার দেখিয়ে দিতে ব'লে চৌকিতে বা চেয়ারে শুয়ে পড়তুম। মাস্টারমশায় দুই তিনবার পড়াটা অর্থ ও ব্যাখ্যা সমেত প'ড়ে যেতেন—তাঁর পড়া শুনেই আমার পড়া শেখা হ'য়ে যেতো।"

নরেন্দ্রনাথের ছোট ভাই মহেন্দ্রনাথ বলেছেন, "নরেন্দ্রনাথ অল্প সময়ের মধ্যে বই পড়তে পারত এবং মুখস্থ করে ফেলত। তাহার অদ্ভুত মেধা ছিল।"

নরেন্দ্রনাথ ছেলেবেলা থেকেই কিরূপ শ্রুতিধর তার একটা ঘটনার কথা বলছি শোন। সিমলা পাড়ায় তার এক বন্ধুর বাড়ী। এক সঙ্গেই দুজনে পড়ে। তাদের বাড়ীর ফুলবাগানে বালক নরেন্দ্রনাথের খুব আনাগোনা। চাঁপা ফুলের গাছে উঠে ব্রহ্মদত্যি দেখবার জন্য নরেন্দ্রনাথ একদিন চুপটি ক'রে বসে আছে। বাড়ীর

বুড়ো কর্তা তাকে দুপুর বেলায় ঐভাবে গাছের ডালে দেখে ধরে ফেলেছেন !

বুড়ো কর্তা রেগে বলেন, "কী হে ছোকরা, দিনরাত বুঝি এই করেই কাটাও ?"

"না, শুধু এই ক'রে কাটাবো কেন ?"—নির্ভয়ে নরেন্দ্রনাথ উত্তর দেয়।

"তবে আর কী করা হয়।"

"কেন আমি খেলাও যেমন করি আবার পড়াও তেমনি ক'রে থাকি।"—

"আচ্ছা, দেখি তুমি কেমন পড়া শিখেছ।"—এই বলেই তিনি ভূগোল, অঙ্ক, কবিতা প্রভৃতি বিষয়ে এক একটি প্রশ্ন করতে থাকেন।

নরেন্দ্রনাথও হটবার ছেলে নয়। সেও চট্‌পট্‌ উত্তর দিতে আরম্ভ করলো।

নরেন্দ্রনাথের মনে রাখবার ক্ষমতা দেখে বৃদ্ধ আশ্চর্য হ'য়ে যান। শোনা যায় বৃদ্ধ নরেন্দ্রনাথের বাবার কাছে বলেছিলেন, "তোমার এই ছেলে বেঁচে থাকলে নামকরা লোক হবে।

নরেন্দ্রনাথকে আরও পরীক্ষা করবার জন্য তিনি জিজ্ঞাসা করেন, "তোমার বাবা-তো এখন লাহোরে ওকালতি করছেন। তুমি কার কাছে পড়।"

নরেন্দ্রনাথ উত্তর দেয়—"কেন, মা এখানে রয়েছেন যে। তিনি আমায় যা করতে হবে তা ব'লে দেন। আমি সেই মত কাজ ক'রে থাকি।"

মায়ের প্রতি নরেন্দ্রনাথের এত ভক্তিশ্রদ্ধার কারণও ছিল। ভুবনেশ্বরী দেবী শুধু মাত্র নরেন্দ্রনাথের লেখাপড়ার বিষয়ে যত্ন করতেন ব'লেই নরেন্দ্রনাথের এত ভক্তি শ্রদ্ধা পান নাই।

নরেন্দ্রনাথ বাল্যকাল থেকেই তাঁর কতকগুলি কাজ দেখে তাঁকে আরও বেশী ক'রে ভক্তি করতে শিখেছিল। তার এই ভাব বিশ্বজয়ী সন্ন্যাসী বিবেকানন্দ হয়েও এতটুকু কমে নাই।

বিশ্বনাথ দত্তের তখন বেশ রুজি-রোজগার। ওকালতি করে বেশ দু'পয়সা তিনি পাচ্ছেন। এই সময় বিশ্বনাথবাবু কলকাতার লালবাগানের এক বনেদী মুসলমান পরিবারের জমিজমা হাইকোর্টের মামলার খরচা বাবদ কিনে নেন। এই সম্পত্তি পরে তিনি তাঁর স্ত্রী ভুবনেশ্বরী দেবীর নামে দলিল করে দেন। ঐ জমিজমা থেকে পরে খুব লাভও হ'তে থাকে। দত্ত মশায় ওদের সব মামলা করতেন।

জমিজমা হারিয়ে ঐ পরিবারটির অল্পদিনের মধ্যেই চরম দুর্দশা উপস্থিত হয়। তখন আর উপায় ভেবে না পেয়ে ঐ পরিবারের কর্তা বিশ্বনাথ দত্তের কাছে এসে তাঁর সাহায্য প্রার্থনা করলেন। দত্তমশায় তাদের ভুবনেশ্বরী দেবীর সঙ্গে দেখা করতে বলেন।

ভুবনেশ্বরী দেবীকেও মুসলমান ভদ্রলোক ঐ কথা নিবেদন করলেন এবং বললেন যে ঐ সম্পত্তির আয় থেকে দত্ত মশায়ের প্রাপ্য টাকা শোধ হয়ে গিয়ে লাভও হয়েছে অনেক। এখন যদি তিনি দয়া ক'রে তাদের সম্পত্তি ফিরিয়ে দেন তবে এই পরিবারটি খেয়ে বাঁচে। কারণ সম্পত্তি এখন ভুবনেশ্বরী দেবীর।

পরিবারের অনেকেই ঘোর আপত্তি জানালেন—' সম্পত্তি একবার কিনে নিলে কেউ আবার ফেরত দেয় নাকি !"

সবকথা শুনে ভুবনেশ্বরী দেবী বলেছিলেন, "দেখ, দিন কতক আগে এদের গাড়ী ঘোড়া ছিল। আজ এমন অবস্থায় পড়েছে যে দুটি ভাতের জন্য ভিক্ষা করতে এসেছে। আমারও ত' ছেলেপুলে আছে। আজ না হয় খুব ভাল অবস্থা, পরে কি হ'বে কে জানে ? গরীব ছেলেদের অন্ন ফিরিয়ে দিই, তাহ'লে আমার ছেলেদের অন্ন ভগবান চিরকাল দেবেন !"

সত্যিই কোন ওজর আপত্তি না শুনে তিনি তাদের সম্পত্তি ফিরিয়ে দেন। বিশ্বনাথবাবুও তাতে কোন আপত্তি করেন নাই। এমন মা না হ'লে অমন ছেলে হয়!

মায়ের জন্য নরেন্দ্রনাথের চিরকাল কেমন একটা টান ছিল, তার আরও দু'একটা ঘটনা ব'লে আমরা অন্য কথা বলবো।

নরেন্দ্রনাথ তখন বিশ্বজয়ী বিবেকানন্দ হ'য়ে মাদ্রাজ শহরে ঘুরছেন। একদিন রাত্রিতে স্বপ্ন দেখলেন মায়ের কি অমঙ্গল হয়েছে কলকাতায়। তিনি পরদিনই কলকাতায় টেলিগ্রাম ক'রে মায়ের খবর জানতে চাইলেন। কলকাতা থেকে মায়ের নিরাপদে থাকবার খবর না আসা পর্যন্ত সিংহবিক্রম বিবেকানন্দ অশান্ত বালকের মত সমস্তক্ষণ ছটফট ক'রে কাটিয়েছিলেন। মায়ের সুসংবাদ এলে তবে সকলের রেহাই।

নরেন্দ্রনাথ সন্ন্যাসী হ'য়ে যাবার পরও তাঁর চিন্তা হ'তো মায়ের দিন কী করে চলবে? ছোট দুই ভাইয়ের মধ্যে একজনও চাকরী করে না। মহেন্দ্রনাথ ও ভূপেন্দ্রনাথ দু'জনই সংসারে উদাসীন। তাই সন্ন্যাসী বিবেকানন্দ তাঁর প্রিয় শিষ্য রাজপুতানার খেতড়ীর রাজা অজিত সিংহকে এক অনুরোধ করলেন। রাজাসাহেব যেন তাঁর মাকে যতদিন তিনি বেঁচে থাকেন মাসে মাসে তাঁর খরচের জন্য এক শত ক'রে টাকা দেন। ভুবনেশ্বরী দেবী যতদিন বেঁচেছিলেন ততদিন শিষ্য গুরুর এই আদেশ অক্ষরে অক্ষরে পালন করেছেন। নরেন্দ্রনাথ যখন ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মশায়ের স্কুলের ছাত্র তখন বিদ্যাসাগরের মাতৃভক্তির কথা বাংলাদেশের সকলের মুখে মুখে। সকল মহাপুরুষেরই ছেলেবেলার সবচেয়ে বড় গুণ দেখা গিয়েছে মায়ের জন্য টান। নরেন্দ্রনাথের মায়ের কথা বড় হয়ে তোমরা আরও জানতে পারবে।

—o—

## "পাগলা বিলে"

নরেন্দ্রনাথ ডানপিটে ছেলে—কি বাড়ীতে আর কি স্কুলে। কিন্তু এই ছটফটে ভাবের মধ্যেও দেখা যেতো নরেন্দ্রনাথ মাঝে মাঝেই কী ভাবে যেন বিভোর হ'য়ে যায়। তখন সে হ'য়ে যেত অন্য মানুষ। যে নরেন্দ্রনাথ কিছুক্ষণ আগে আমোদ-আহ্লাদ ক'রে সহপাঠীদের সকলকে মাতিয়ে তুলেছিল, এক নিমেষের মধ্যেই সে যেন কী দেখে চুপচাপ হয়ে যেতো। তখন হাসি-তামাসা তার যেন কোথায় মিলিয়ে যেতো। এই অবস্থা হ'লে তার সঙ্গি-সাথীদের মনে ভয় হ'তো। একটা ঝড়ের আগে আকাশ-বাতাস যেমন থমথমে ভাবের হয়ে যায়, নরেন্দ্রনাথেরও সে সময়ের অবস্থা তাই হ'তো। এই সময় ভাবের মুখে নরেন্দ্রনাথ হঠাৎ বলে উঠতো, "আমি রাজা হ'বো!" সাথীরা ভাব'তো, "বিলেটা তবে পাগ্‌লা হ'য়ে যাবে নাকি?" কিন্তু তা নয়। এই ভাবের ঝোঁকটা কেটে গেলে আবার তার দুষ্টুমি শুরু হ'তো। তাই স্কুলে নরেন্দ্রনাথের আর একটা নাম ছিল "পাগলা বিলে।"

নরেন্দ্রনাথের এই ভাবুকতা তার চিরদিনের সঙ্গী।

নরেন্দ্রনাথের বয়স যখন ১৪ বছর (৮ম শ্রেণীতে পড়বার সময়—১৮৭৭ খৃষ্টাব্দে) তখন সে খুবই অসুস্থ হ'য়ে পড়ে। এই সময় তার বাবা মধ্যপ্রদেশের রায়পুরে থাকেন—কলকাতা থেকে অনেক দূর। তিনি নরেন্দ্রনাথের মাকে লিখলেন যে, নরেনকে সঙ্গে ক'রে তিনি যেন রায়পুরে চলে আসেন। রায়পুরে যাবার জন্য তখন কলকাতা থেকে এলাহাবাদ ও জব্বলপুর পর্যন্ত মাত্র একখানা রেলগাড়ীতে যাওয়া যেতো। কারণ রেলগাড়ী ভারতবর্ষে চলতে শুরু করেছে মাত্র ১৮৫৬ খৃষ্টাব্দ থেকে। জব্বলপুর থেকে আবার নাগপুর পর্যন্ত ভিন্ন রেলপথ দিয়ে যেতে হ'তো। কিন্তু ঐ পর্যন্তই রেলপথ শেষ।

নরেন্দ্রনাথ রায়পুরে যাবার জন্য রওনা হ'লো কলকাতা থেকে মাকে নিয়ে। কলকাতা শহরের বাইরে যে একটা দুনিয়া আছে তার সাথে নরেন্দ্রনাথের এই প্রথম পরিচয়। নরেন্দ্রনাথের এই প্রথম রেলগাড়ী চড়বারও আনন্দ। নতুন দেশ দেখবারও আনন্দ।

মাকে নিয়ে নরেন্দ্রনাথ কলকাতা থেকে এলাহবাদ হ'য়ে নাগপুর পর্যন্ত রেলগাড়ীতে গেল। কিন্তু সেখান থেকে নরেন্দ্রনাথকে যেতে হ'বে রায়পুর। আরও অনেক দূর। নাগপুর থেকে পাহাড়ী পথে গরু বা মোষের গাড়ীতে ক'রে যেতে হবে। সেখানে পৌঁছুতে লাগবে প্রায় পনের দিন।

দল বেঁধে গরুর গাড়ী যাত্রীদের নিয়ে একদিন রওনা হ'লো ঐ পথে। কারণ একলা যাওয়া খুবই ভয়ের ব্যাপার। পথে ডাকাত ও ঠ্যাঙ্গারেদের উপদ্রব।

গাড়ীতে যেতে যেতে ছোট বড় কত গ্রাম, ফসলে ভরা কত সবুজ মাঠ, ছোট বড় কত নদ-নদী, উঁচুনীচু কত পাহাড় নরেন্দ্রনাথের পথে পড়লো। অসীম আকাশের নীচে প্রকৃতি-দেবী যেন এক সুন্দর মেলা সাজিয়ে রেখেছেন। নরেন্দ্রনাথ যতই দেখে ততই সে ঐ আকাশ, বাতাস, গ্রামের পথ-ঘাট, পাহাড়-পর্বত সবাইকে ভালবেসে ফেলে। সবাই যেন তার আপনার জন। মহা আনন্দে মাকে নিয়ে বালক নরেন্দ্রনাথ বাবার কাছে চলেছে। কিন্তু হঠাৎ একদিন কী যেন তার হ'লো।

গরুর গাড়ীটা সেদিন চলেছে একটা পাহাড়ের গা ঘেঁযে। সে পাহাড়ের নাম হ'লো বিন্ধ্য পর্বত।

আমাদের মুনি-ঋষিরা বলেছেন গাছপালা, পাহাড়-পর্বত যা দেখছ সবারই ভেতরে প্রাণশক্তি রয়েছে। কেউ প্রাণহীন নয়। পুরাণের গল্প থেকে জানা যায় যে সূর্যদেবের সারথি অরুণ। তাঁর সাত রঙের

সাতটি ঘোড়ার রথে প্রতিদিন সূর্যদেবকে চড়িয়ে আকাশপথে বিন্ধ্য পর্বতের মাথার উপর দিয়ে চলে যান। তাই দেখে বিন্ধ্য পর্বতের খুব রাগ হ'লো। একদিন সে সূর্যদেবের রথ দিলো আটকে—কিছুতেই পথ ছেড়ে দিলো না। এদিকে সূর্যের আলো না পেয়ে সৃষ্টি রসাতলে যায় আর কি!

তখন দেবতারা ব্রহ্মার স্তব করতে লাগলেন তাঁর ধ্যান ভাঙ্গাবার জন্যে। তিনি ধ্যানে সব টের পেয়ে দেবতাদের বললেন, "তোমরা বিন্ধ্যের গুরু অগস্ত্য মুনির কাছে যাও।"

অগস্ত্য মুনির কাছে দেবতারা এসে স্তব আরম্ভ করলেন, যাতে তিনি বিন্ধ্যকে বশে আনতে পারেন। অগস্ত্য মুনি সব শুনে বিন্ধ্যের কাছে গেলেন। বিন্ধ্য মাথা নীচু ক'রে তার গুরুদেবকে প্রণাম ক'রে বললো, "প্রভু কি আদেশ?" অগস্ত্য মুনি বললেন, "আমি তপস্যায় যাচ্ছি। ফিরে না আসা পর্যন্ত মাথা উঁচু ক'রো না।" এই বলে গুরু যে তপস্যায় গেলেন আর ফিরলেন না।

বিন্ধ্যের মাথা হেঁট করা পেয়ে সূর্যদেব আবার তাঁর রথে চলতে আরম্ভ করলেন। সৃষ্টি রক্ষা হ'লো।

গুরুর আদেশ মেনে নিয়ে বিন্ধ্য পর্বত আজও মাথা নীচু ক'রে দাঁড়িয়ে আছে। তাই আজও কেউ ফিরে না এলে বলা হয়, "উনি অগস্ত্য যাত্রা করেছেন।"

সেই বিন্ধ্য পর্বতের গা ঘেঁষে সেদিন গাড়ী যাচ্ছে। পাহাড়ের ছোট বড় চূড়া সব চারদিকে ছড়িয়ে রয়েছে। তারই মাঝখান দিয়ে চলে গেছে একটানা পথ। তার যেন আর শেষ নেই।

সেই নির্জন পথের চারদিক ঘিরে রয়েছে ঢেউ-এর পর ঢেউ তোলা পাহাড়ের চূড়াগুলি। পাহাড়ী পথ-ঘাট। তার সাথে পাহাড়ের গা-ভরা নানা জাতের সবুজ গাছপালা চারদিকের শোভা আরও বাড়িয়ে তুলেছে।

বালক নরেন্দ্রনাথ প্রকৃতির এই শোভা দেখতে দেখতে ভাবে বিভোর হয়ে পড়ে—কোন দিকে তার হুঁশ থাকে না। এইভাবে গাড়ীতে চলতে চলতে নরেন্দ্রনাথ হঠাৎ দেখে যে ছোট বড় দুটি পাহাড়ের চূড়া এক জায়গায় এসে এমন ভাবে গা ঘেঁষে রয়েছে যে দেখে মনে হয় যেন একজন বুড়ো মানুষ একটি ছোট ছেলেকে আদর করছে। ভাবুক নরেন্দ্রনাথের মন বাইরের জগৎ ছেড়ে ভাবের জগতে চলতে আরম্ভ করে। এই ভাবের ঘোরে নরেন্দ্রনাথ দেখে যে সেই পাহাড়ের গায়ে একটা মস্ত বড় মৌমাছির চাক উঁচু থেকে নীচু পর্যন্ত ঝুলে রয়েছে। হাজার হাজার মৌমাছি সেই বাসায় মধু যোগান দিচ্ছে বনের নানা জায়গা থেকে। আর পাহাড়ের গা বেয়ে মধু ঝড়ে যাচ্ছে।

নীল আকাশের গায়ে হেলান দিয়ে রয়েছে দুটি পাহাড় কতকাল ধ'রে। তাদের গায়ের ওপর যেন রঙ-বেরঙের পোশাক পড়িয়ে দিয়েছে ঐ সবুজ গাছের দল। আর অনন্ত কাল ধ'রে মধুর ভাণ্ড ভ'রে খাবার জুগিয়ে রেখেছেন প্রকৃতি দেবী।

নরেন্দ্রনাথের মনে ভাবের ঢেউ আরও প্রবল হ'লো। সে ভাবের ঘোরে নিজেরই কাছে প্রশ্ন করে, "কে এই সব সৃষ্টি করেছে? কে তাদের এমন ক'রে সুন্দর ভাবে সাজিয়ে রেখেছে? কোথা থেকেই বা এই মৌমাছির দল নীরবে মধু নিয়ে আসছে? কতদিন ধ'রে? কে তাদের স্রষ্টা, কার কথায় তারা সবে কাজ করে? কার জন্যে এই মধু তারা যোগায়?

"এই বিশ্বমাঝে যেখানে যা সাজে
তাই দিয়ে তুমি সাজিয়ে রেখেছ।"

এই সব কথা ভাবতে ভাবতে গরুর গাড়ার মধ্যে কখন যে গভীর ভাবের রাজ্যে নরেন্দ্রনাথের মন একদম ডুবে যায় সে কথা নিজেও টের পায় না।

তবে কি নরেন্দ্রনাথ ঘুমিয়ে পড়লো? না,—একটা ভাবের সাগরে নরেন্দ্রনাথের সমস্ত শরীর ও মন তখন ভেসে বেড়াচ্ছে। শুধু একটি ভাবই সেই সমুদ্রের অসীম জলরাশি। সে ভাব হ'লো, "কে এই সব কিছুর স্রষ্টা?" আর সেই ভাবসমুদ্রে নরেন্দ্রনাথ যেন একটা ঢেউয়ের ফেনা ভেসে বেড়াচ্ছে। সমুদ্রেই তার জন্ম আবার সমুদ্রেই সে মিলিয়ে যাবে।

যখন নরেন্দ্রনাথের হুঁশ হ'লো তখন গাড়ী অনেক দূর এগিয়ে গিয়েছে। ভুবনেশ্বরী দেবী দেখলেন বেলা গড়িয়ে পড়েছে। কিন্তু দুরন্ত ছেলের কোন হুঁশই নেই। ঘণ্টার পর ঘণ্টা ধরে ছেলে চোখ বুজেই রয়েছে। ধাক্কা দিয়ে তিনি ছেলেকে জাগিয়ে দিলেন, "কিরে বিলে, আর কত ঘুমুবি! দেখ, গাড়ী পাহাড় ছেড়ে কোথায় চ'লে এসেছে। এখন আমরা নদী পার হচ্ছি। তুই দেখবি নে?"

মায়ের ডাকে নরেন্দ্রনাথের হুঁশ হতেই ভাবের নেশা কেটে গেল। চোখ মেলে সে দেখে এই পৃথিবী আর সেই স্বপ্নের পৃথিবী এক নয়। জীবনে প্রথম নরেন্দ্রনাথ একটা নতুন জিনিসের স্বাদ পেলো। কিন্তু কী তার রূপ তাতো সে জানে না।

বড় হ'য়ে নরেন্দ্রনাথ নিজেই সেদিনের এই ভাবের নেশার কথা বলেছেন। তাঁর মন সেদিন এই বিশ্বের যিনি রচয়িতা অর্থাৎ ভগবানের চিন্তায় তলিয়ে গিয়েছিলো। বাইরের কোন বিষয়ের দিকে তার সেদিন সেই সময়ে হুঁশই ছিল না। এই ভাব তাকে মাতোয়ারা ক'রে দিয়ে গেল। নরেন্দ্রনাথের জীবনে ধ্যানের এই হ'লো প্রথম জোয়ার।

রায়পুরে পৌঁছে নরেন্দ্রনাথের স্বাস্থ্য ক্রমশঃ ভাল হ'তে থাকে। কাজেই তার বাবা তখন তার পড়াশুনার দিকে নজর দিলেন। বিশ্বনাথবাবু দেখলেন যে এখানে স্কুল নেই। কিন্তু ছেলের পড়াশুনা বন্ধ

থাকে তা তিনি চান না। নিজেই ছেলের লেখাপড়ার দেখাশুনা করতে লাগলেন। তিনি নরেন্দ্রনাথের যা পড়বার বই তাছাড়াও আরও বই তাকে কিনে দিতে লাগলেন। ইতিহাসের বই, বিজ্ঞানের নানা আবিষ্কারের বই। আরও কত রকমের বই। নরেন্দ্রনাথ বইয়ের মেলায় নিজেকে হারিয়ে ফেলে।

"পৃথিবীতে কত জানবার আছে—
তার আমি কতটুকু জানি ?"

নরেন্দ্রনাথের মনে এখন থেকে এই এক প্রশ্ন—"এই বিরাট পৃথিবীর আমি কতটুকু জানি ?" পিতৃ-পুত্রে এখন থেকে তাই প্রতিদিন একসঙ্গে বসে লেখাপড়ার কথা, জ্ঞান-বিজ্ঞানের কথা আলোচনা চলতে থাকে। কিশোর বালকের মনে কত প্রশ্ন আর পিতার মনে ছেলেকে জানিয়ে দেবার কি আগ্রহ ! এমন পিতা ক'জনের হয় !

শোনা যায় রায়পুরে এক বৎসরের ওপরে থাকবার পর নরেন্দ্রনাথের বাবার এক বন্ধু একদিন সন্ধ্যার সময় দত্তমশায়ের বৈঠকখানায় এসেছেন। সেদিন দত্তমশায়ের ফিরতে একটু দেরি হয়েছে। তাই তিনি কিশোর নরেন্দ্রনাথের সঙ্গে আলাপ জুড়ে দিলেন সময়টা কাটাবার জন্য। তিনি ভাবলেন সাধারণ বালক কি কথা বলবে ! একথা-সেকথার আলাপ হ'তে হ'তে সেই সময়ের প্রসিদ্ধ সাহিত্যিকদের লেখার কথা এসে যায়।

"তুমি নাম-করা কার বই পড়েছ ?"

"বাবার কাছে মধুসূদন দত্তের কবিতা শুনেছি।"—নরেন্দ্রনাথ উত্তর দেয়। কিন্তু বৃদ্ধ বিশ্বাস করতে রাজী নন।

তাই তিনি নরেন্দ্রনাথকে পরীক্ষা করবার জন্য মধুসূদন দত্তের বা অন্য কোন কবির একটি কবিতা থেকে আবৃত্তি করতে বলেন।

নরেন্দ্রনাথ অমনি গড়গড় ক'রে মুখস্থ ব'লে চলে।

মধুসূদন ১৮৭৩ খৃষ্টাব্দে মারা গেছেন কত দুঃখের মধ্যে। কিন্তু তাঁর লেখা কবিতাবলী তখন বাংলার গুণিজন সবাই পড়ে প্রশংসা করেছেন। আবার কিছু কিছু লোক তাঁর নতুন অমিত্রাক্ষর ছন্দের লেখাকে ঠাট্টা ক'রে বলতে শুরু করলেন. "ওটা কবিতাই হয়নি " কিন্তু শেষ পর্যন্ত তাঁরা হেরে গেলেন। নতুনেরই জয় হ'লো। মধুসূদনের লেখা নরেন্দ্রনাথের চিরকাল খুবই প্রিয় ছিল সেকথা আমরা আগেই বলেছি। মধুসূদনের "আত্মবিলাপ" কবিতাটি বাংলার গুণিজনের কাছে খুবই প্রিয়। কে জানে নরেন্দ্রনাথ সেই কবিতার একটি অংশই সেদিন আবৃত্তি করেছিলো কিনা! আমরা তোমাদের জন্য সেই কবিতার প্রথম অংশটি তুলে দিলাম—

"রেখ মা দাসেরে মনে
এ মিনতি করি পদে
সাধিতে মনের সাধ
ঘটে যদি পরমাদ
মধুহীন ক'রো না'ক
তব মনঃকোকনদে।"

বৃদ্ধ দেখলেন নরেন্দ্রনাথ তার বাবার কাছে এঁদের কথা শুধু শুনেছে তাই নয়—তাঁদের লেখা থেকে কিছু কিছু অংশ মুখস্থও ক'রে ফেলেছে।

বিশ্বনাথ দত্তকে তাঁর এই বৃদ্ধ বন্ধু পরে বলেছিলেন, "দেখো, তোমার এই ছেলে বাংলা সাহিত্যে একদিন নাম করবে।"

তাঁর এই কথা অক্ষরে অক্ষরে সত্য হয়েছে।

নরেন্দ্রনাথ বিবেকানন্দ হ'য়ে "পরিব্রাজক," "বর্তমান ভারত," "ভাববার কথা" এবং "প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য" বই যখন বাংলা ভাষায় লিখলেন তখন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁর প্রশংসায় পঞ্চমুখ হ'য়ে উঠলেন।

পরে স্বামী বিবেকানন্দের নতুন ধরনের এই জোরালো বাংলা ভাষার নামই হয়েছিল "খাপখোলা তলোয়ার"। তাঁর লেখার মধ্যে ছিল নতুন ভাবের এমনই তেজ। তাঁর ভাষার মধ্যে ছিল এমনই প্রাণ-মাতানো সুর।

রায়পুরে থাকবার সময় থেকেই নরেন্দ্রনাথ তার বাবার সঙ্গে সহজ সরল ভাবে আলোচনায় যোগ দিতে সুযোগ পায়। এর ফলে বয়সের তুলনায় সে কিছুটা বেশী "স্পষ্টবক্তা" হ'য়ে ওঠে। শোনা যায় তার বাবার সঙ্গে সেই বয়স থেকেই যুক্তি-তর্ক দিয়ে এক একদিন বাদানুবাদ করতে লেগে যেতো। ভুবনেশ্বরী দেবী পিতা-পুত্রের এই কথা কাটাকাটি দেখে ভাবতেন, "আমার বিলেরই শেষ পর্যন্ত জিত হবে।"

মায়ের প্রাণ কিনা, ছেলের ওপরই বেশী টান।

একদিন বাড়ীতে একজন লোক বিশ্বনাথবাবুর বৈঠকখানায় এসে কোন বিষয়ে কথা কাটাকাটি সুরু ক'রে দেন। এদের কথার মধ্যে হঠাৎ নরেন্দ্রনাথ সেখানে এসে পড়ে। ঐ ভদ্রলোকের কথা শুনে নরেন্দ্রনাথ স্বাধীন ভাবে নিজের মত বলতে সুরু করে। তখন ভদ্রলোক তাতে বাধা দিয়ে একটু অবহেলার সুরে বললেন, "আরে বাপু, তুমি থামো না।" নরেন্দ্রনাথের ঐ ভদ্রলোকের কথায় মনে ভারি রাগ হ'লো। আর নরেন্দ্রনাথের রাগ হ'লে রক্ষে নেই।—"কী, আমার বাবা পর্যন্ত আমাকে ঐ রকম করে কথা বলেন না। আর এই লোকটি আমাকে অপমান করবে?"

তরুণ নরেন্দ্রনাথ ফোস্ ক'রে উঠে ভদ্রলোকটিকে উত্তর করলো, "আপনাদের মত কিছু লোক ভাবে বয়স কম হ'লেই সবাই বোকা।" নরেন্দ্রনাথের উত্তর শুনে ভদ্রলোক আশ্চর্য হ'য়ে যান।

নরেন্দ্রনাথকে কেউ হেলাফেলা করবে এটা সে জীবনের শেষ

দিন পর্যন্ত সহ্য করতে পারতো না। তাই তাঁর নরেন্দ্রনাথ নাম সার্থক হ'য়েছিল। নরেন্দ্রনাথ সব সময়েই বড়। কারো থেকে ছোট নয়। জীবনে নরেন্দ্রনাথ তিন জনের কাছে শুধু শিশুর মত নিজেকে মনে করতো। একজন হ'লো তার মা ভুবনেশ্বরী দেবী, দ্বিতীয় ঠাকুর শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংস দেব আর তৃতীয় জননী সারদামণি দেবী।

নরেন্দ্রনাথের মধ্যে এই বড় হওয়ার ভাব এক এক সময়ে খুবই বেশী ক'রে জাগতো। তাই এক এক সময় অনেকের কাছে মনে হ'তো ছেলেটা একটু "ডেঁপো"। একদিন নরেন্দ্রনাথ তার বাবার সঙ্গে কথা-কাটাকাটি করতে করতে হঠাৎ বলে বসলো—"আপনি আমার জন্য কী করেছেন ?" যৌবনের প্রারম্ভে কিশোর বয়সের সহজ সরল তেজী ভাব। দুম ক'রে নরেন্দ্রনাথ বাবাকেই ঐ কথা বলে বসে।

বিশ্বনাথবাবু কিন্তু ছেলের ঐ কথায় রাগ না ক'রে শান্তভাবে ছেলেকে উত্তর করলেন—"যা, আয়নার সামনে নিজের চেহারাটা একবার দেখে নে। তারপর ও-কথা বলবি।"

আয়নার সামনে নরেন্দ্রনাথ নিজের 'রাজপুত্রের' মত চেহারাটা দেখে বাবার মুখের দিকে আর তাকাতে পারলো না। বিশ্বনাথ বাবু এইভাবেই নরেন্দ্রনাথকে শিক্ষা দিতেন।

তার কিছুদিন আগের আরও একটি ঘটনা।

একদিন কলকাতার বাড়ীতে নরেন্দ্রনাথ তার মা'র ওপর রাগ ক'রে তাঁকে কী একটা কটু কথা বলেছে। তাতে ভুবনেশ্বরী দেবী খুবই মনে ব্যথা পান। বিশ্বনাথবাবু হাইকোর্ট থেকে ফিরে এসে সব শুনলেন। তিনি নরেন্দ্রনাথকে সরাসরি কিছু বললেন না।

পরের দিন তিনি এক মজার কাণ্ড করলেন নরেন্দ্রনাথকে শিক্ষা

দেবার জন্য। বন্ধু-বান্ধবদের সঙ্গে নরেন্দ্রনাথ যে ঘরে বসে পড়াশুনা করে সেই ঘরের দরজার গায়ে তিনি লিখে দিলেন; "নরেন্দ্রনাথ তার মাকে গতকাল......কথা বলেছে। তাতে তার মার মনে খুবই দুঃখ হয়েছে।" বন্ধু-বান্ধবেরা সবাই তাদের লীডরকে প্রশ্ন করে, "কীরে বিলে, তুই এই কথা সত্যি বলেছিস?" লীডরের শিক্ষা হয়ে গেল জীবনের মত।

এই শিক্ষা পেয়ে নরেন্দ্রনাথ আর কোনোদিন কারো সাথে কটু ব্যবহার করতো না। বিশ্বনাথবাবুর শিক্ষা দেবার রীতি ছিল এমন সুন্দর। সেই শিক্ষা বালকের মনে কঠিন পাথরে যেন খোদাই হ'য়ে রইলো। নরেন্দ্রনাথ বড় হয়ে বার বার বলেছে, "যে মাকে ভক্তি শ্রদ্ধা করতে পারে না, সে কখনো বড় হ'তে পারে না।"

এমনি ক'রে আরও একদিন বিশ্বনাথবাবু নরেন্দ্রনাথকে শিক্ষা দেন। বিশ্বনাথবাবুর বাড়ীতে অনেক গরীব আত্মীয় স্বজন থাকতো। তাদের খাওয়া-পরা সবই বিশ্বনাথবাবুই চালাতেন। তাদের মধ্যে অনেকেই অলস প্রকৃতির ছিল। একজন আবার নেশাও করতো। তার খরচও বিশ্বনাথবাবুই দিতেন।

একদিন নরেন্দ্রনাথ এদের আচ্ছা ক'রে কড়া কথা শুনিয়ে দিল। "কেন, কাজ ক'রে খেতে পারো না?"

তাদের মধ্যে একজন উত্তর করলো, "কাজ কোথায় পাব বল?"

উত্তেজিত নরেন্দ্রনাথ বলে বসলো—"তা'হলে পথ দেখ। নেশা ক'রে পড়ে থাকা এখানে চলবে না।"

কথাটা বিশ্বনাথবাবুর কানে উঠলো। তিনি ছেলেকে ডেকে এনে বললেন,—"জীবনে কখনো দুঃখ কষ্ট পেয়েছিস কি? ওদের কী দুঃখ তা এখন তুই কী বুঝবি? যখন বড় হবি তখন বুঝবি।... কাকেও কটু কথা বলে মনে দুঃখ দিতে নেই।"

শুধু কথা বলেই ক্ষান্ত রইলেন না। তিনি সজাগ রইলেন যেন নরেন্দ্রনাথ কখনো ঐরূপ ব্যবহার আর কারো প্রতি না করে। একাধারে স্নেহ ও শাসন দুই-ই সমানভাবে চালিয়ে তিনি নরেন্দ্রনাথের চরিত্রের এই দিকটা সংশোধন করে দেন।

শোনা যায় নরেন্দ্রনাথ এই সময় যৌবনের পথে পা দেবার মুখে দাবা খেলায় খুব পটু হয়ে ওঠে। পুত্রের ভাব দেখে পিতা একটু চিন্তিত হ'লেন। তিনি দেখলেন পুত্রের স্বাস্থ্য তখন বেশ ভাল হয়ে গেছে। তাই তাদের সকলকেই রায়পুর থেকে কলকাতায় পাঠিয়ে দেওয়া স্থির করলেন। কলকাতায় ফিরে এসে নরেন্দ্রনাথের বিদ্যালয়ের জীবন আবার সুরু হ'লো।

প্রায় দু'বছর পর রায়পুর হ'তে নরেন্দ্রনাথ কলকাতায় ফিরে এলো সুন্দর স্বাস্থ্য আর প্রখর তেজ নিয়ে। বিদ্যালয়ে ফিরে এলে নরেন্দ্রনাথের বন্ধুরা তার দেবকান্তি রূপ দেখে আনন্দে আটখানা। কিন্তু মুস্কিল হ'লো যখন নরেন্দ্রনাথ নবম শ্রেণীতে ভর্তি হ'তে চাইলো। শিক্ষকদের মধ্যে কেউ কেউ আপত্তি করলেন যে এতদিন বিদ্যালয়ে পাঠ না ক'রে কীভাবে সে প্রবেশিকা পরীক্ষার জন্য তৈরী হবে? শেষ পর্যন্ত হেডমাষ্টার শ্রীযুক্ত প্রসন্নচন্দ্র রায় মশায় নরেন্দ্রনাথকে পরীক্ষা ক'রে বিদ্যালয়ে ভর্তি ক'রে নিলেন। সে বোধ হয় ১৮৭৭-৭৮ খৃষ্টাব্দের কথা। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে তখন প্রবেশিকা পরীক্ষা হ'তো। ভর্তি হবার কিছুদিন পরেই শ্রেণীর বাৎসরিক পরীক্ষা। প্রায় সমস্ত বৎসরের পড়া তাকে অল্প দিনের মধ্যেই তৈরী করতে হ'লো। শেষ পর্যন্ত নরেন্দ্রনাথ পরীক্ষায় পাশ ক'রে দশম শ্রেণীতে উঠলো।

নরেন্দ্রনাথের একরোখা মন। যখন যেটি ধরবে তাকে ছাড়বে না।

বন্ধুবান্ধবদের মধ্যে ফিরে এসে নরেন্দ্রনাথ আবার আসর জমিয়ে তুললো। খেলা-ধূলা, আমোদ-আহ্লাদ, তর্ক-বিতর্ক সব কিছুতেই সে মধ্যমণি। কাজেই বছরের গোড়ার দিকে পরীক্ষার পড়ার জন্য খুব বেশী সময় দেবার অবসর নরেন্দ্রনাথের ছিল না। তাছাড়া সে অভ্যাসও তার ছিল না। কিন্তু মনে রাখবার ক্ষমতা ছিল নরেন্দ্রনাথের অসাধারণ। বছরের গোড়ার দিকে নরেন্দ্রনাথ ক্লাসে গুরুমশায় যা পড়াতেন তা শুনে যেতো। অনেকে ভাবতো নরেন যেমন আনমনা পরীক্ষায় যে কী করবে তা কে জানে? তাকে ত' গাদা গাদা অন্য বই-ই পড়তে দেখা যায়। পড়ার বই-এর সঙ্গে তার দেখা-সাক্ষাৎ কখন হয়?

নরেন্দ্রনাথের সমবয়সী গুরুভাই স্বামী সারদানন্দ "শ্রীরামকৃষ্ণ লীলা প্রসঙ্গ" পুস্তকে লিখেছেন, "বড় হ'য়ে পরীক্ষার দু'তিন মাস থাকিবার কালে সে পাঠ্যপুস্তক সকল পড়িতে আরম্ভ করিত। অন্য সময়ে আপন অভিরুচি মত অন্য সকল বই পাঠ করিত।

"নরেন্দ্রনাথের এই সময় এক একবার এক এক বিষয়ের পুস্তক পাঠের জন্য প্রবল আগ্রহ দেখা দিত। তখন ঐ বিষয়ের যত বই পাওয়া যাইত, সেইগুলিকে সে কোন রকমে সংগ্রহ করিয়া পাঠ করিত।"

যখন সত্য সত্যই পরীক্ষা এসে দরজায় ঘা মারতো তখন নরেন্দ্রনাথের হুঁশ হ'তো। আর অমনি সে উঠে-পড়ে লেগে যেতো পরীক্ষার পড়া তৈরী করবার জন্য। তার নিজের কথাই তার প্রমাণ। ছাত্রজীবনের কথাপ্রসঙ্গে নরেন্দ্রনাথ পরে এই রকম কথাই বলেছে—

"প্রবেশিকা (তখন এণ্ট্রান্স) পরীক্ষার মাত্র দুই তিন দিন আগে দেখি জ্যামিতি কিছুই আয়ত্ত হয় নাই। তখন সমস্ত রাত্রি জাগিয়া উহা পাঠ করিতে লাগিলাম এবং চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে উহার চারিখানি পুস্তক আয়ত্ত করিয়া ফেলিলাম।" এরূপ কাণ্ড নরেন্দ্রনাথের মত

অসাধারণ বিদ্যার্থীর পক্ষেই সম্ভব। কাজেই সাধারণ ছাত্রদের কাছে এই অভ্যাস সমূহ বিপদের কারণ হ'তো।

স্বামী বিবেকানন্দের এই ছাত্রজীবনের অসাধারণ মেধার বিষয়ে তাঁর জীবনী-লেখক শ্রীপ্রমথনাথ বসু মশায় এই কথাগুলি লিখেছেন ঃ "তিনি ( নরেন্দ্রনাথ ) এত অল্প সময়ে বহু বিষয়ের অধিকার করিতেন এবং সে সকল বিষয় এত দীর্ঘকাল পর্যন্ত তাহার স্মরণ থাকিত যে, অন্যের পক্ষে তাহা বিশ্বাস করাই অসম্ভব হইয়া পড়ে। তবে যাঁহারা স্বচক্ষে তাহা দেখিয়াছেন, তাঁহারা অনেকে এখনও জীবিত থাকিয়া নিজমুখে এ বিষয়ের প্রমাণ দিতেছেন। সেইজন্য আমরা এরূপ অসম্ভব ব্যাপার সত্য বলিয়া বিশ্বাস না করিয়া থাকিতে পারি না।"

স্বামী সারদানন্দ বলেছেন, "অনেক বালক তাহার ( নরেন্দ্রনাথের ) দেখাদেখি আমোদ-প্রমোদে কাল কাটাইতে যাইয়া কখন কখন আপন পাঠাভ্যাসের ক্ষতি করিয়া বসিত।"

নরেন্দ্রনাথের ঐরূপ অভ্যাস হবার কারণও ছিল। বয়সের তুলনায় পিতার যত্নে, নরেন্দ্রনাথের নানা রকম বই পড়বার অভ্যাস গ'ড়ে উঠে।

ঐরূপ পড়বার এবং জানবার আগ্রহ যদি কোন বিদ্যার্থীর জীবনে একবার দেখা দেয়, তবে যখন যে বিষয়ে তার মন ব'সে যায় সেই বিষয়ের বইগুলিকে সে তন্ন তন্ন ক'রে পড়ে ফেলতে থাকে। নরেন্দ্রনাথের বাল্যবন্ধু স্বামী সারদানন্দ এর প্রমাণ দিয়ে লিখেছেন—

"প্রবেশিকা পরীক্ষা দিবার পূর্বে তিনি ইংরাজী ও বাংলার সমগ্র সাহিত্য ও অনেক ঐতিহাসিক গ্রন্থ পাঠ করিয়াছিলেন। যেমন ১৮৭৯ খৃষ্টাব্দে প্রবেশিকা পরীক্ষা দিবার বৎসরের আরম্ভ হইতেই ভারতবর্ষের ইতিহাস সমূহ পড়িবার তাঁহার প্রবল আগ্রহ উপস্থিত হইল। মার্শমান, এলফিনষ্টোন প্রমুখ ঐতিহাসিকগণের গ্রন্থসকল নরেন্দ্রনাথ এই সময় তন্ন তন্ন করিয়া পড়িয়া ফেলিয়াছিলেন।"

ছাত্রজীবনে এই জানবার আগ্রহ যার মনে যত জেগেছে সে-ই জীবনে উন্নতির পথে তত পা বাড়িয়েছে বুঝতে হ'বে। যার জানবার আগ্রহ নেই, বুঝতে হবে জীবনে বড় হবার আগ্রহও তার নেই।

নরেন্দ্রনাথের জানবার আগ্রহ ও শিখবার আগ্রহ জীবনের শেষদিন পর্যন্ত প্রখর ছিল। ১৮৭৯ খৃষ্টাব্দে নরেন্দ্রনাথ যখন মেট্রোপলিটন স্কুল থেকে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের এণ্ট্রান্স পরীক্ষা দেয়, তখন তার বয়স ১৬ বছর হলেও বয়সের তুলনায় কিন্তু বিদ্যার রাজ্যে সে অনেক বেশি দূর প্রবেশ করেছে।

তার সমান বয়সের ছাত্রদের তুলনায় সে অসাধারণ একথা আমরা আগেই দেখেছি। কৈশোর ও যৌবনের সন্ধিক্ষণে নরেন্দ্রনাথের বুদ্ধির এই প্রখরতা সকলের কাছেই ধরা পড়তো। তারা অবাক হয়ে ভাবতো—নরেনের এত বুদ্ধি কী করে হ'লো? তাদের সকলকে চমক লাগিয়ে নরেন্দ্রনাথ ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের মেট্রোপলিটন মেইন স্কুল থেকে ১৬ বছর বয়সে ১৮৭৯ খৃষ্টাব্দে এণ্ট্রান্স পরীক্ষায় প্রথম বিভাগে পাশ করে। ঐ বছর মেট্রোপলিটন স্কুল থেকে একমাত্র নরেন্দ্রনাথই প্রথম বিভাগে পরীক্ষায় পাশ করেছিল, তাই স্কুলে নরেন্দ্রনাথের নামে ছাত্র-মাস্টার সকলেই ধন্য ধন্য করতে লাগলো। * পরীক্ষায় ছেলের এই সফলতার জন্য বিশ্বনাথ বাবু সুন্দর একটি হাতঘড়ি তাকে উপহার দেন।

একটা ডেঁপো দুষ্টু ছেলে মাত্র ১ বৎসর প'ড়ে এমন ভাল পাশ করলো!

"দেখ, মনের জোর আর বুদ্ধি থাকলে মানুষ সব করতে পারে"।—নরেনের প্রধান শিক্ষক মশায় ছাত্রদের বললেন।

---

* নরেন্দ্রনাথের সমবয়সী ডাঃ মনোমোহন গাঙ্গুলী—তাঁর ১৯০৫ খৃঃ লেখা—*The Swami Vivekananda—A Study* বইতে লিখেছেন.

"He (Narendranath) was admitted into the Metropolitan Institution. After some time he was transferred to Shampukur Branch of the Metropolitan Institution but he appeared from the Main Metropolitan at the Entrance Examination and passed in the First Division.

—দুই—

# যুবক নরেন্দ্রনাথ

আমাদের শাস্ত্রে বলেছে যে, ছেলে যখন ১৬ বছর বয়সের হ'বে তখন তার সঙ্গে বন্ধুর মত ব্যবহার করবে। বিশ্বনাথ বাবু তাই ছেলেকে মনের মত ক'রে সাজিয়ে তখনকার দিনের নামকরা সরকারী কলেজ—প্রেসিডেন্সী কলেজে ভর্তি করে দিলেন তখনকার দিনের এফ. এ. (ফার্স্ট-আর্টস্) ক্লাসে, যাকে এখন আই. এ. ক্লাস বলা হয়।

নিজের মনে যেমন কোন হীন ভাব ছিল না ছেলেরও মনে কোন হীন ভাব না আসে তা-ই নরেন্দ্রনাথের বাবা চাইতেন।

মহেন্দ্রনাথ দত্ত বলেছেন, "বাবা কোন দুঃখচেটো ভাব দেখতে পারতেন না।" নরেন্দ্রনাথ কলেজে এ'লো রাজপুত্রের মত বেশে। যেমন সুঠাম শরীরের গড়ন, তেমনি সুন্দর তার পোশাক। প্রেসিডেন্সী কলেজ তখন পুরাদস্তুর সাহেবী কলেজ। তখনকার দিনের বেশীর ভাগ বাঙ্গালী বড়লোকই ছেলেকে এখানে পড়াতেন সাহেবী কায়দায় গড়ে তোলবার জন্য। ছেলে বড় হয়ে সাহেব হবে।

বিশ্বনাথ দত্ত কিন্তু ছেলেকে ঐ বিলিতী ঢংয়ে তৈরী করতে চাইলেন না। ওদের দেশের যা ভাল তা শিখবো, কিন্তু তাই বলে দেশের কথা ভুলে গিয়ে! তা হবে না।

নরেন্দ্রনাথের কলেজী পোশাক হ'লো সাদা পাজামার ওপর কালো আলপাকার মোগলাই চাপকান। হাতে বাবার দেওয়া সুন্দর হাত-ঘড়িটি। তার মাথায়ও বেশ ঘন কালো কোঁকড়ান চুল ছিল। সেই সুন্দর চুলের ওপর টেরী কেটে যুবক নরেন্দ্রনাথ যখন কলেজে ঢুকতো

তখন মনে হ'তো বুঝি-বা কোন রাজপুত্রই এসে ক্লাসে ঢুকলো। নরেন্দ্রনাথের বয়স তখন ১৭ বছর। ১৮৮০ খৃষ্টাব্দের ২৭শে জানুয়ারী তারিখে ১২ টাকা মাস মাহিনা আর ১০ টাকা ভর্তি ফি মোট ২২ টাকা দিয়ে কলেজে নাম লেখানো হ'লো নরেন্দ্রনাথের।

এই সময় কলকাতার স্বদেশী ভাব কেবল লেগেছে। "হিন্দু-মেলা"র কথা আগেই বলেছি। জোড়াসাঁকোর ঠাকুরবাড়ীতে তখন স্বদেশী-ভাবের ধূম লেগেছে। রবীন্দ্রনাথেরও বয়স এই সময় মাত্র ১৭।১৮ বছর। কিশোর রবীন্দ্রনাথ নরেন্দ্রনাথের প্রায় সমান বয়সের--একটু বড়। রবীন্দ্রনাথ নরেন্দ্রনাথের মতই পোশাক পরতেন—পাজামার ওপর জড়ির কাজ করা মখমলের চাপকান, মাথায় জড়ির টুপি। সতের বছর বয়সের রবীন্দ্রনাথের যে ছবি পাওয়া গেছে তাতে এই পোশাকেই তাঁকে দাঁড়ানো দেখা যায়। স্বদেশীভাব তখনকার দিনে যে সব বড় বড় বাঙ্গালী পরিবারে ঢুকেছে সেখানেই ঐরকম পোশাক—মুসলমানী ঢং মেশানো। পুরোপুরি সাহেবী নয়। কিন্তু সাহেবী ভাব কলকাতায় তখন খুব বেশী। ইংরেজী লেখাপড়া জানা পরিবারের মধ্যে সাহেবী পোশাক না পড়লে কাউকে ভদ্রলোকই বলা হ'তো না। কি ঠাকুরবাড়ী কি নরেন্দ্রনাথের পরিবার কেউই এইভাব নেয় নাই। প্রেসিডেন্সী কলেজে তখন সাহেবদের রাজত্ব। কলকাতার অধিকাংশ যুবকদের মধ্যেই এই ভাবের প্রবল প্রভাব। সাহেব হ'য়ে যাওয়াটাই তখন এই যুবকদের একমাত্র কাম্য। কেনই বা হবে না? তাদের বড় যারা তারাই ত চলা-ফিরা. খানা-পিনা, পোশাক-আসাক সব বিষয়ে কালা সাহেব। তখনকার দিনের বাঙ্‌লার বিখ্যাত নাট্যকার রসরাজ অমৃতলাল বোসের লেখা 'ব্যাপিকা-বিদায়" আর "সধবার একাদশী" নাটকে এই সব কালা সাহেবদের চরিত্রের নানা মজার কথা তোমরা জানতে পাবে।

বয়সের অনুপাতে নরেন্দ্রনাথ পড়াশুনার ব্যাপারে সকলের চেয়ে এগিয়ে ছিল। প্রেসিডেন্সী কলেজে এফ. এ. ক্লাসে ভর্তি হয়ে নরেন্দ্রনাথ পড়াশুনা বেশীদিন করতে পারে নাই। একবছর পড়্বার পর যথারীতি দ্বিতীয় শ্রেণীতে উঠলো নরেন্দ্রনাথ। কিন্তু ঐ বছরই তার ম্যালেরিয়া জ্বর হ'তে আরম্ভ করে। তখনকার দিনে ম্যালেরিয়া একটা ভয়ের কারণ ছিল। কত লোক যে ঐ জ্বরে বাঙ্লা দেশে মরেছে তার ঠিকঠিকানা নেই! নরেন্দ্রনাথের কলেজে যাওয়া ঐ ভয়ানক অসুখে ভুগে ভুগে বন্ধ হ'লো। শেষ পর্যন্ত প্রেসিডেন্সী কলেজ থেকে পরীক্ষা দিতেই দেওয়া হবে না ব'লে তাকে জানিয়ে দেওয়া হ'লো। কারণ কলেজে এতদিন অনুপস্থিত থেকে পরীক্ষা দেওয়া সম্ভব নয়।

নরেন্দ্রনাথ হতাশ হ'য়ে হাল ছেড়ে দিল। কিন্তু বিশ্বনাথ বাবু হাল ছাড়লেন না। চিকিৎসা ক'রে তাকে খানিকটা ভাল করে তুলেই তিনি বাড়ীর কাছে জেনারেল অ্যাসেম্বলীজ্ ইনস্টিটিউশন-এ (হেঁদোর পাড়ে—এখনকার স্কটিস্ চার্চ কলেজ) তাকে দ্বিতীয় শ্রেণীতে ভর্তি করে দিতে চাইলেন। কলেজের শিক্ষকগণ তাকে পরীক্ষা ক'রে ভর্তি করে নিয়ে নিলেন। এই কলেজ থেকেই নরেন্দ্রনাথ এফ. এ. পরীক্ষা দিয়ে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের দ্বিতীয় পরীক্ষায় পাশ করলো। সে হ'লো ১৮৮১ খৃষ্টাব্দের কথা।

নরেন্দ্রনাথের জীবন কলেজে এসে এক নতুন পথে চলতে আরম্ভ করে। পড়াশুনার ব্যাপারে নরেন্দ্রনাথ তার সহপাঠীদের তুলনায় অনেক এগিয়ে গিয়েছিলো। এফ. এ. ক্লাশে পড়বার সময় নরেন্দ্রনাথ যে সকল বিষয়গুলিতে বিশেষভাবে মনোনিবেশ ক'রলো তার মধ্যে প্রধান ছিল ইতিহাস ও দর্শনের বইগুলি। গিবনের রোম সাম্রাজ্যের উত্থান-পতনের কাহিনী, গ্রীনের ইংলণ্ডের ইতিহাসের উত্থান-পতনের কাহিনী, এলিসনের ইউরোপের ইতিহাসের ফরাসী-বিপ্লবের কাহিনী

এবং ভারতবর্ষের ইতিহাসের প্রাচীন গৌরবময় কাহিনী ছাড়াও গুপ্ত বংশের হিন্দু রাজগণের এবং মোগল বাদশাহ্‌দের গৌরবপূর্ণ কাহিনীর প্রতি নরেন্দ্রনাথের টান ছিল সবচেয়ে বেশী।

এফ. এ. শ্রেণীতে লজিক বা যুক্তিবিদ্যা তাকে পড়তে হ'তো। একে বুদ্ধিতে প্রখর, তার ওপর যুক্তি-তর্কের সূত্রগুলি নরেন্দ্রনাথ একে একে আয়ত্ত ক'রে কলেজে বক্তৃতায়, তর্কে, আলোচনায় সকলকে মাতিয়ে তুলতো। কলেজে নরেন্দ্রনাথের সঙ্গে যাঁরা পরিচিত ছিলেন তাঁদের মধ্যে আচার্য ব্রজেন্দ্রনাথ শীল, ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায়, নগেন্দ্রনাথ গুপ্ত প্রভৃতি মনীষিগণ সকলেই বলেছেন যে নরেন্দ্রনাথ তখন থেকেই নিজের ভেতরকার ক্ষমতা যেন বেশ ভালভাবেই বুঝতে পারতো এবং তার প্রয়োগ করতেও চেষ্টা করতো।

ইতিহাস ও দর্শন ছাড়া ইংরেজী ও বাংলা সাহিত্যের দিকে নরেন্দ্রনাথের ঝোঁক এখন থেকে আরও বেড়ে যায়। কলেজে এসে নরেন্দ্রনাথের মন যেন এক খোলা মাঠে খেলে বেড়াতে অবাধ সুযোগ পেল। ইংরেজী সাহিত্যের কবিদের মধ্যে নরেন্দ্রনাথের সব চেয়ে প্রিয় কবি হয়ে উঠে ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থ। বাঙলা সাহিত্যে তখন ঈশ্বর গুপ্তের যুগ চলে যাচ্ছে; রঙ্গলাল, মধুসূদন, নবীনচন্দ্র, হেমচন্দ্র ও বঙ্কিমচন্দ্রের যুগ সুরু হয়েছে। মাইকেলের বীরভাব নরেন্দ্রনাথের খুবই ভালো লাগতো। আর সংস্কৃত ভাষা স্কুল থেকেই নরেন্দ্রনাথ লিখতে-পড়তে আরম্ভ করেছিল এবং পরে ঐ ভাষায় কথাবার্তায়ও সে পটু হ'য়ে ওঠে। বড় হয়ে পণ্ডিতদের সঙ্গে সংস্কৃত ভাষায় নরেন্দ্রনাথ শাস্ত্রালোচনাও করেছে।

স্বামী বিবেকানন্দের জীবনীতে নরেন্দ্রনাথের কলেজ-জীবন বিষয়ে শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ বসু মশায় এই কথাগুলি লিখেছেন:

"স্কুলের ন্যায় কলেজেও তিনি শীঘ্রই সকল বালকের শীর্ষস্থান অধিকার করিয়াছিলেন। পদে পদে অপর অপেক্ষা তাঁহার শ্রেষ্ঠত্ব

প্রতিপন্ন হওয়াতে সকলে আপনা হইতেই তাঁহাকে নেতা বলিয়া স্বীকার করিয়া লইল। প্রণালীবদ্ধ চিন্তা, তর্ক ও যুক্তিতে কেহ তাঁকে আঁটিয়া উঠিতে পারিত না। ক্লাসে তর্ক আরম্ভ হইলে খেলার সময় পর্যন্ত তার জের চলতো। যুক্তি ও বিচার সাহায্যে প্রত্যেক জিনিস খণ্ড খণ্ড করিয়া বিশ্লেষণ করা এখন হইতেই তাঁহার অভ্যাস হইয়াছিল। বলা-কহায় কেহ তাঁহার সমকক্ষ ছিল না। রহস্য-বিদ্রূপে, আমোদ-প্রমোদে, ক্রীড়া-সঙ্গীতে—সকল বিষয়েই তিনি সমান অগ্রণী ছিলেন।

"তাঁহার সিংহবিক্রমে সকলে যেন তটস্থ থাকিত। কলেজে প্রবিষ্ট হইয়াও তিনি পূর্ববৎ নতুন একটা কিছু শুনিলে বা করিতে পারিলে তৎক্ষণাৎ সেই দিকেই ছুটিতেন। কিন্তু স্কুলে পড়ার সময় যেমন তিনি সকল সময় ক্রীড়ামগ্ন থাকিতেন, কলেজে পড়ার সময় সেরূপ ছিলেন না। কলেজজীবনে তিনি খুবই অধ্যয়নরত হইয়াছিলেন। কিন্তু সে অধ্যয়ন শুধু কলেজ-পাঠ্য পুস্তকে সীমাবদ্ধ ছিল না। নভেল, নাটক, মাসিক পত্রিকা, খবরের কাগজ ও সাময়িক রচনাদির প্রতি তার ঝোঁক ছিল। তা ছাড়া গণিত, ইতিহাস, কাব্য, সাহিত্য এবং প্রাচ্য ও পাশ্চাত্ত্য উভয় প্রকারের দর্শনই তিনি বিশেষ মনোযোগের সহিত আয়ত্ত করিয়াছিলেন।"

ইতিহাস, দর্শন, ইংরেজী ও বাংলা সাহিত্য এমন কি সংস্কৃত সাহিত্যেও নরেন্দ্রনাথের আগ্রহ সমবয়সীদের তুলনায় অনেক বেশী ছিল একথা আমরা আগেই বলেছি। কলেজের পড়াশুনার সাথে সাথে নরেন্দ্রনাথের গণিত ও গণিত-জ্যোতিষ শাস্ত্রেও আগ্রহ বাড়তে থাকে এবং বি. এ. ক্লাশে পড়বার সময় উচ্চাঙ্গের গণিত অভ্যাস তার একটা আনন্দের বিষয় হ'য়ে দাঁড়ায়।

নরেন্দ্রনাথের কলেজজীবনে আনন্দের অফুরন্ত উৎসের যেন দুয়ার খুলে গেল। সুকণ্ঠ নরেন্দ্রনাথের কণ্ঠে গান শোনবার জন্য অধ্যাপক,

সহপাঠী সকলের সমান আগ্রহ। একদিন ক্লাসে অধ্যাপক আসতে দেরী হয়। ক্লাস ফাঁকা। বন্ধুবান্ধবেরা নরেন্দ্রনাথকে ধরলো একটা গান করতে। বন্ধুবান্ধবের অনুরোধ কাটাতে পারে না সে। নরেন্দ্রনাথ মধুর স্বরে গান আরম্ভ করলে ক্লাসের সব ছেলে তাকে ঘিরে বসলো।

ইতিমধ্যে কখন যে সাহেব প্রফেসার ক্লাসের বাইরে দরজার সামনে এসে দাঁড়িয়ে গান শুনছেন সে বিষয়ে কারো কোন খেয়াল নেই। গান শেষ হ'লে তিনি ক্লাসে ঢুকে গায়কের খুবই প্রশংসা করেন।

জেনারেল অ্যাসেম্বলীজ ইনস্টিটিউশনে পড়বার সময় আর একদিন একটি খুবই মজার কাণ্ড হয়েছিল। তখন নরেন্দ্রনাথ সম্ভবত বি. এ. শ্রেণীর ছাত্র। কলেজের প্রিন্সিপ্যাল হলেন বিখ্যাত পণ্ডিত ও দার্শনিক ড. উইলিয়ম হেস্টি সাহেব। ছাত্রদের একটি বিতর্ক-সভা কলেজে ছিল। সেদিন অধিবেশনে ড. হেস্টি সাহেবের সভাপতির আসন গ্রহণ করবার কথা। কিন্তু কোন জরুরী কাজের জন্য সেদিন তিনি ছাত্রদের ডেকে বললেন যে আজ সভায় নরেন্দ্রনাথ সভাপতির আসন গ্রহণ করবে। ছাত্রদের মধ্যে কেউ কেউ একটু অবাক হ'লো। কারণ কোথায় প্রিন্সিপ্যাল হেস্টি সাহেব আর কোথায় যুবক নরেন্দ্রনাথ! কিন্তু, সেদিন সভার কাজ নরেন্দ্রনাথ এমন যোগ্যতার সাথে পরিচালনা করলে যে সকলে তার জ্ঞানের প্রসারতা এবং বক্তৃতার ক্ষমতা দেখে আশ্চর্য হয়ে গেল।

নরেন্দ্রনাথ এখন পড়াশুনার মধ্যে ডুবে থাকে। বাড়ীতে পড়াশুনার ব্যাঘাত হয়। তাই নির্জন স্থান বেছে নিল তার দিদিমার বাড়ীর দোতালার একটি ছোট কুঠরী-ঘরে। এই বাড়ীটি ছিল রামতনু বসুর গলিতে। সেখানেই প্রায় সমস্ত দিন নিরিবিলিতে তার পড়াশুনা চলে। এই নির্জন ঘরে পড়বার সময় নরেন্দ্রনাথের

একটা ভাবান্তর হ'তে থাকে। বাইরের শত চিন্তার মধ্যে থেকেও নরেন্দ্রনাথ এখানে একাকী। তার ভাবুক মন চিন্তার রাজ্য থেকে ধ্যানের রাজ্যে মাঝে মাঝে ডুবে যায়। কে যেন তাকে ডাকে। কিন্তু কে সে ?

নরেন্দ্রনাথ এই পড়বার ঘরটির নাম দিয়েছিল "টঙ্"। যতক্ষণ পর্যন্ত না তার পড়া শেষ হ'তো ততক্ষণ নরেন্দ্রনাথ এ ঘর থেকে বেরুতো না। ছোটবেলার পড়বার অভ্যাস এখন সম্পূর্ণ বদলে গেল। বাইরে যেমন আমোদে-আহ্লাদে, খেলা-ধূলায়, গান-বাজনায় নরেন্দ্রনাথ চৌকস ছেলে, নির্জন ঘরে এসেও নরেন্দ্রনাথ তেমনি আপন ভাবে বিভোর ভোলানাথ। সেখানে সে একা—কেউ তার দলে নেই। নিজের পথ নিজে বেছে নেবার জন্য কে যেন তাকে ভেতর থেকে কেবলই তাগিদ্ দিচ্ছে।

পড়তে পড়তে দিন গিয়ে রাত্রি হ'তো। হুঁশ নেই। যদি কখনো পড়বার সময় ঘুম পেতো তখন তার জন্য ব্যবস্থা ছিল কঠোর। নরেন্দ্রনাথ নিজেই বলেছেন—"আমি ঘরের ভিতর বই নিয়ে বসতুম, আর পাশেই একটা পাত্রে গরম চা ও কফি থাকতো। ঘুম পেলেই পায়ে একটা দড়ি বাঁধতুম, তারপর ঘুমের ঝোঁকে বেহুঁশ হয়ে পড়লে যেই পায়ের দড়িতে টান পড়তো অমনি আবার জেগে উঠতুম।"

এই সময় থেকেই পোশাক-পরিচ্ছদের চাকচিক্যের দিকেও নরেন্দ্রনাথের উদাসীনতা দেখা যেতে থাকে। বাইরের এই পরিবর্তন আসলে তার মনের মধ্যে তখন যে ঝড় উঠেছে তারই আভাস।

নরেন্দ্রনাথের বয়স তখন ১৮ বছর। ১৮৮১-৮২ খৃষ্টাব্দ হবে।

# বিদ্যার্থী বিবেকানন্দ

নরেন্দ্রনাথ যখন কলেজের ছাত্র (১৮৮০ খৃষ্টাব্দ) তখন কলকাতায় কেশবচন্দ্র সেন তাঁর 'নববিধান ব্রাহ্মসমাজে' বক্তৃতা ক'রে কলকাতার শিক্ষিত নরনারীকে মাতিয়ে তুলেছিলেন। তাঁর সঙ্গে স্যার সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জির রাজনৈতিক বক্তৃতা শহরময় আরও উত্তেজনা জাগিয়েছিল। যুবকদের কাছে এসব ছিল নতুন আকর্ষণ। একদিকে নতুন ধর্ম আন্দোলন আর একদিকে নতুন রাজনৈতিক আন্দোলন।

১৮৭৫ খৃষ্টাব্দে সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জিকে ভারতবর্ষের সর্বোচ্চ চাকুরি ইণ্ডিয়ান সিভিল সার্ভিস থেকে বরখাস্ত করা হ'লে তিনি প্রথমে বিদ্যাসাগরের মেট্রোপলিটন স্কুলে এবং পরে রিপণ কলেজে অধ্যাপনা করতে লাগলেন আর দেশময় বক্তৃতা দিয়ে বেড়াতে লাগলেন। তাঁর সঙ্গে দেখা দিলেন আনন্দমোহন বসু। তিনি হলেন ছাত্র-আন্দোলনের প্রধান উদ্যোক্তা।

কেশবচন্দ্র সেন ছিলেন মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের শিষ্য। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ রাজা রামমোহন রায়ের মৃত্যুর পর (১৮৩৩ খৃঃ) নতুন ধর্মের প্রচার করলেন—"ব্রাহ্মধর্ম" (১৮৪৩ খৃষ্টাব্দ)—তখনকার দিনে খৃষ্টান পাদরীদের প্রচারের পাল্টা আন্দোলন। পরে কেশবচন্দ্র, মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের সমাজ ('আদি ব্রাহ্ম সমাজ') থেকে পৃথক্ হয়ে গিয়ে নতুন সমাজ ("ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্ম সমাজ") গঠন করলেন (১৮৬৬ খৃঃ)—সব নতুন নতুন কর্মী নিয়ে; বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী, শিবনাথ শাস্ত্রী এবং আরো অনেকে এই সমাজে যোগ দিলেন। পরে তাঁদের মধ্যেও মতবিভেদ দেখা দিল। তখন কেশবচন্দ্র সেন "নববিধান" বলে নতুন সমাজ গঠন করলেন। আর অপর দল আলাদা হয়ে গিয়ে "সাধারণ ব্রাহ্ম সমাজ" গঠন করলেন (১৮৭৮ খৃষ্টাব্দ)।

কলকাতার ওপর দিয়ে নতুন ভাবের নতুন হাওয়া বইতে লাগলো। ১৮৫৭ খৃষ্টাব্দে হ'লো সিপাহী-বিদ্রোহ—যার সুরু হ'লো কলকাতার

উপকণ্ঠে ব্যারাকপুরে। বাংলার চাষীদের ওপর অত্যাচারের ফলে "নীল" কুঠিয়াল ইংরেজদের বিরুদ্ধে বাংলা দেশে বিদ্রোহ দেখা দিল এর কিছুদিন বাদেই। তারই ছবি আমরা দেখতে পাই দীনবন্ধু মিত্রের লেখা "নীলদর্পণ" নাটকে। এই সময় রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর নতুন কবিতায় যে ভাবটি দেশের সকলের মনে চাপা ছিল তা প্রকাশ করলেন ঃ—

"স্বাধীনতা-হীনতায় কে বাঁচিতে চায় রে,
কে বাঁচিতে চায় ?
দাসত্ব-শৃঙ্খল বল কে পরিবে পায় হে,
কে পরিবে পায় ?" ইত্যাদি।

কলকাতার মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের জোড়াসাঁকোর বাড়ীতে সুরু হ'লো তরুণদের নতুন গোপন সভা—"সঞ্জীবনী সভা"। আর বড়দের নতুন সঙ্ঘের পত্তন করলেন নবগোপাল মিত্র মশায় ১৮৬৭ খৃষ্টাব্দে। তার নাম দিলেন তিনি 'হিন্দু-মেলা'। ১৮৭৫ খৃষ্টাব্দে ভারতের প্রথম সঙ্ঘবদ্ধ রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান 'জাতীয় কংগ্রেসে'র প্রতিষ্ঠা হলো। কলকাতার চারিদিকে একটা সাজ সাজ রব। একদিকে খৃষ্টান মিশনারীদের হিন্দুধর্ম-বিরোধী প্রচার, অন্য দিকে ব্রাহ্মসমাজের হিন্দুর দেবদেবীকে বাদ দিয়ে নিরাকার ব্রহ্মের প্রচারের সঙ্গে সঙ্গে নতুন সামাজিক ও ধর্মীয় আন্দোলন। আর একদিকে হিন্দু কলেজের খৃষ্টানপন্থী হিন্দু ছাত্রদের আপন দেশ ও সমাজকে উপেক্ষা ক'রে তীব্র প্রচারের ধূম, —এই নানারূপ প্রচার ও বাদানুবাদের মধ্যে কলকাতা থেকে কিছুটা দূরে দক্ষিণেশ্বরে ১৮৫৫ খৃষ্টাব্দে জানবাজারের জমিদার রাণী রাসমণি নতুন কালীমূর্তির প্রতিষ্ঠা করলেন। বিগ্রহের নামকরণ হ'লো "ভবতারিণী।"

এই দক্ষিণেশ্বরের মন্দিরের পূজক হ'য়ে এলেন হুগলী জেলার কামারপুকুর গ্রামের এক নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণ—রামকুমার চট্টোপাধ্যায়। কলকাতার ঝামাপুকুরে তাঁর একটি সংস্কৃত শিক্ষার চতুষ্পাঠী ছিল। সেখানে তিনি তাঁর ছোট ভাই গদাধর চট্টোপাধ্যায়কে নিয়ে এলেন। কারণ বাড়ীতে তার পড়াশুনো হচ্ছে না। সে বলে, "ও-চাল-কলা মূলোর বিদ্যে দিয়ে কী হবে?"

গদাধর যখন কলকাতায় এলো (১৭৫২-৫৩ খৃঃ) তখন তার বয়স ১৬ বছর মাত্র। তিন বছর পর তার বড় ভাই রামকুমার মারা গেলেন। তখন গদাধরই শ্রীশ্রীভবতারিণী কালীর পূজক নিযুক্ত হলেন ১৮৫৬ খৃষ্টাব্দে।

এই গদাধরই আমাদের শ্রীরামকৃষ্ণ। তিনি প্রায় ১২ বছর দক্ষিণেশ্বরে তপস্যা করলেন—এক একবার এক এক ধর্মমতে। শেষে এই সিদ্ধান্তে এলেন যে—"সকল ধর্মই সত্য। ঈশ্বর সাকারও আবার নিরাকারও। যেমন জলের কোন আকার নেই। কিন্তু বরফ হয়ে জমে গেলে আকার হয়। আবার গলে গলে যে সেই।" কলকাতার জ্ঞানী-গুণী লোক তাঁকে দেখতে দক্ষিণেশ্বরে চললেন।

নরেন্দ্রনাথ যখন জেনারেল অ্যাসেম্ব্লীজ ইনস্টিটিউশনের ছাত্র তখন থেকেই সে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের কাছে যাতায়াত করে। তিনি তাকে ধ্যান শিক্ষা দেন। আবাব নতুন ব্রাহ্ম সমাজ—"সাধারণ ব্রাহ্ম সমাজে"-ও নরেন্দ্রনাথ যাতায়াত করছে সাধারণ সভ্য হিসেবে। সেখানে নরেন্দ্রনাথের প্রাণ-মাতানো গানের জন্য বেশ নামও আছে।

চারদিকের এ সব সন্দেহ ও নানামুখী প্রচারের মধ্যে নরেন্দ্রনাথের মনে সব সময়ই একটি প্রশ্ন উঁকি মারে—"ঈশ্বর আছেন কিনা? ঈশ্বর কি মানুষের কল্পনামাত্র!" সভা সমিতিতে নরেন্দ্রনাথ যাতায়াত করছে।—কত কথা শুনছে—ধর্ম, দর্শন, রাজনীতি, দেশের উন্নতি—

আরো কত কি বিষয়ে। কিন্তু তার মনের প্রশ্নের উত্তর পায় না সে। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের কাছে মাঝে মাঝেই নরেন্দ্রনাথ যায় ধ্যান অভ্যাস করবার জন্য। একদিন গঙ্গার ওপর নৌকোতে মহর্ষিদেব ব্রাহ্ম ভক্তদের নিয়ে বসে আছেন এমন সময় নরেন্দ্রনাথ তাঁকে এক অদ্ভুত প্রশ্ন করলো।

"আপনি কি ভগবান দেখেছেন ?"

নরেন্দ্রনাথের গলার স্বরে একটা তীব্র আবেগের ভাব ! দেবেন্দ্রনাথ যুবকের তীব্র অনুরাগের ভাব দেখে খুবই আশ্চর্য হলেন। তিনি নরেন্দ্রনাথকে উৎসাহ দিয়ে বললেন—"তোমার চক্ষু দু'টিতে যোগীর লক্ষণ।"

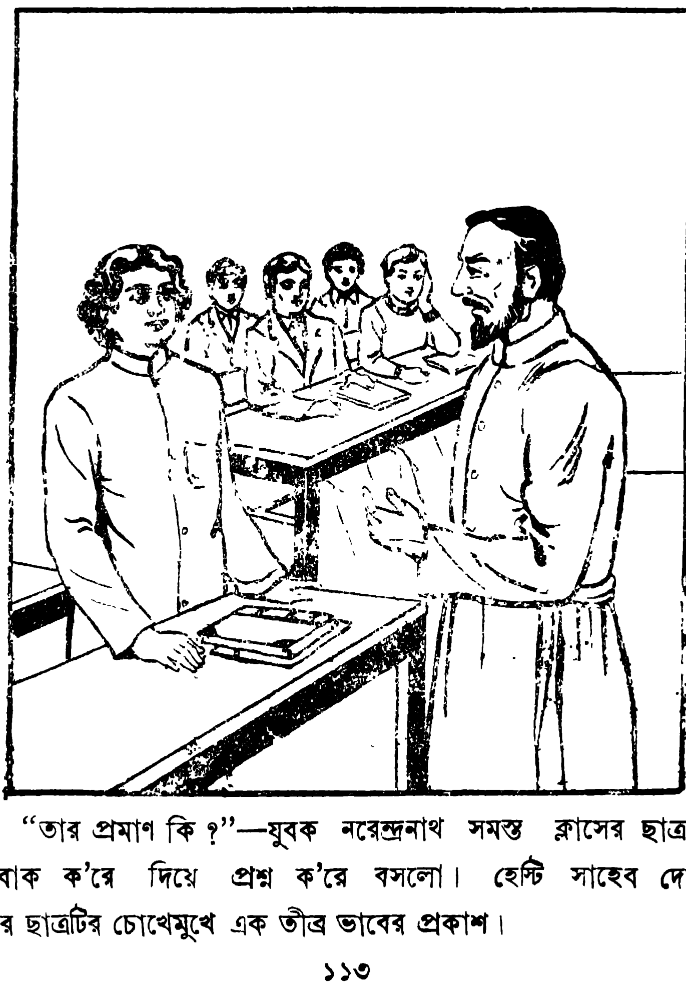
কিন্তু নরেন্দ্রনাথের সহজ প্রশ্নের উত্তর কৈ ?

জেনারেল অ্যাসেমব্লীজ ইনস্টিটিউশনের দর্শনের কৃতী ছাত্র নরেন্দ্রনাথ তখন এফ. এ. ( এখনকার আই. এ. ) পরীক্ষা দেবার জন্য তৈরী হচ্ছে। পাশ্চাত্যের বিখ্যাত দার্শনিকদের নানা বই পড়ছে। পুঁথির পাতায় তার মনের প্রশ্নের উত্তর কই ? ভগবানকে কি দেখা যায় ? তার একই প্রশ্ন ! কে তার এই প্রশ্নের উত্তর দেবে ?

সেই সময় নরেন্দ্রনাথের মনের তীব্র অশান্তির কথা আমরা জানতে পারি বিখ্যাত দার্শনিক আচার্য ব্রজেন্দ্রনাথ শীল মশায়ের লেখা থেকে। তিনি নরেন্দ্রনাথের সঙ্গে ঐ কলেজেই পড়তেন—এক শ্রেণী উঁচুতে। আচার্য ব্রজেন্দ্রনাথ বলেছেন যে—"তার ( নরেন্দ্রনাথের ) মানসজগতের ইতিহাসে সঙ্কটসময়ের এই ছিল সূচনা। এই কালের মধ্যেই তার মধ্যে ধীরে ধীরে জেগে ওঠে এক বিচিত্র আত্মানুভূতি......নৈরাশ্য ও সংশয়ের কথা সে অকপটে আমার কাছে ব্যক্ত করলো।"

এর কিছুদিন আগে থেকেই কলকাতার জ্ঞানী-গুণী ব্যক্তিদের মধ্যে দক্ষিণেশ্বরের পাগলা বামুন গদাধর চট্টোপাধ্যায়ের কথা প্রচার হচ্ছিল।

জেনারেল অ্যাসেমব্লীজ ইনস্টিটিউশনে একদিন প্রিন্সিপ্যাল উইলিয়ম হেস্টি সাহেব ইংরেজীর ক্লাস নিচ্ছেন। তিনি দার্শনিক কবি ওয়ার্ডস-ওয়ার্থের একটি কবিতা পড়াচ্ছেন। প্রকৃতির শান্ত পরিবেশের বর্ণনা করতে করতে কবি বলছেন যে আমাদের আশে-পাশে যে সুন্দর প্রকৃতি আনন্দের ভাণ্ডার খুলে রেখেছে, সে আনন্দ মানুষের মনে ঈশ্বরের অনুভূতি এনে দেয়।



"তার প্রমাণ কি ?"—যুবক নরেন্দ্রনাথ সমস্ত ক্লাসের ছাত্রদের অবাক ক'রে দিয়ে প্রশ্ন ক'রে বসলো। হেস্টি সাহেব দেখেন তাঁর ছাত্রটির চোখেমুখে এক তীব্র ভাবের প্রকাশ।

তিনি উত্তর করলেন, "যাঁরা ঈশ্বরের দেখা পেয়েছেন তাঁরাই একথার প্রমাণ দিতে পারেন।'

"এমন ব্যক্তি কে আছেন?"—প্রশ্ন করে নরেন্দ্রনাথ।

হেস্টি সাহেব নরেন্দ্রনাথকে বললেন যে তিনি কলকাতার উত্তরে দক্ষিণেশ্বরের মন্দিরের এক পূজারী ব্রাহ্মণের কথা শুনেছেন। তাঁর কাছে গেলে নরেন্দ্রনাথ হয়'ত এই প্রশ্নের উত্তর পেতে পারে।

নরেন্দ্রনাথ সহজে কোন কথা মেনে নেবার ছেলে নয়। তাঁর দক্ষিণেশ্বরে যাবার আগ্রহ তখনই দেখা গেল না। এদিকে বাড়ীতে নরেন্দ্রনাথের বিয়ের কথা চলতে থাকে। অমন সুন্দর ও লেখা-পড়া জানা ছেলে! কিন্তু সে-দিকে তার ভ্রূক্ষেপ নেই। নরেন্দ্রনাথের মনের ভাব বুঝতে পেরে তাদেরই একজন আত্মীয় ডাঃ রামচন্দ্র দত্ত একদিন তাকে বললেন—"যদি সত্যিই ঈশ্বরকে জানবার জন্য এত আগ্রহ তবে এখানে-সেখানে না ঘুরে দক্ষিণেশ্বরে যাও না কেন বাপু! সেখানে গেলে তোমার প্রশ্নের সমাধান হবে।"

এই সময়ে কেশবচন্দ্র সেন শ্রীরামকৃষ্ণের সংস্পর্শে এসে তাঁর কাগজ 'সুলভ সমাচারে' লিখলেন, "দক্ষিণেশ্বরের পরমহংস সামান্য সাধু নহেন। এক্ষণে পথিবীর মধ্যে এত বড় সাধু আর কেহ নাই। এই মহাত্মাকে যতবার দেখি ততবারই তাঁর দিব্যজীবন দেখিয়া অবাক হইতেছি।"

ইতিমধ্যে একটা আশ্চর্য ব্যাপার ঘটে গেল। কথায় বলে—'ভক্তের হৃদয় ভগবানের বৈঠকখানা। সেখানে এসে ভগবান নিজেই যে কখন উপস্থিত হন তা ভক্তও টের পায় না।'

১৮৮১ সালের নভেম্বর মাসের একটি দিন। সিমলা পাড়ায় সেদিন দুপুর বেলা হঠাৎ খোঁজাখুঁজি সুরু হ'লো নরেন্দ্রনাথের। ঐ পাড়ার সুরেন্দ্রনাথ মিত্র মশায়ের বাড়ীতে দক্ষিণেশ্বরের মন্দিরের পূজারী ব্রাহ্মণ শ্রীরামকৃষ্ণ এসেছেন। তিনি গান বড় ভালবাসেন।

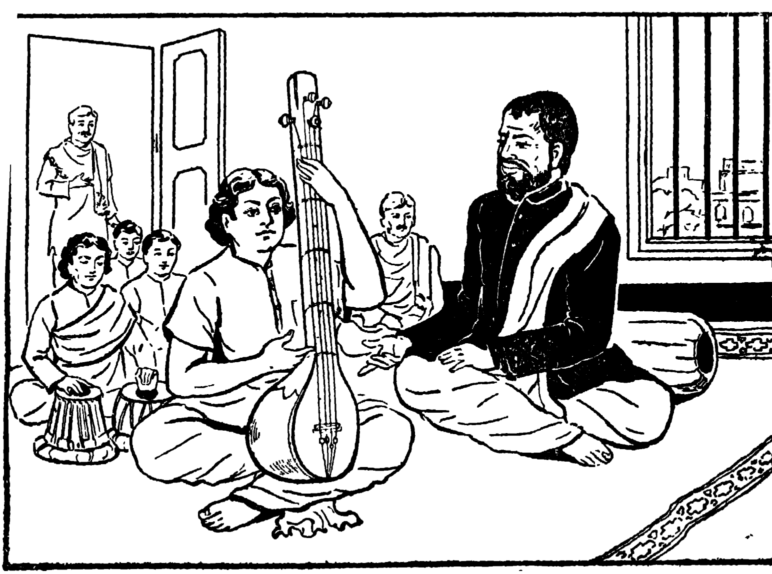
নিজেও সুন্দর গান করেন। গান গাইতে গাইতে ভগবানের নামে মাতোয়ারা হয়ে যান। নরেন্দ্রনাথের ডাক পড়লো শ্রীরামকৃষ্ণকে সেদিন ভজন গান শোনাবার জন্য। অনেক খোঁজাখুঁজির পর নরেন্দ্রনাথকে পাওয়া গেল। শ্রীরামকৃষ্ণের সঙ্গে নরেন্দ্রনাথের প্রথম দেখা এই ভাবেই হয়েছিল।

গান হয়ে যাবার পর নরেন্দ্রনাথের খুব কাছে এসে শ্রীরামকৃষ্ণ তার গা, হাত, পা, মুখ, চোখ সব বিশেষভাবে দেখে বললেন—"একদিন দক্ষিণেশ্বরে আসবি, কেমন ?"

নরেন্দ্রনাথ বুঝলো এ সেই দক্ষিণেশ্বরের পুজারী ব্রাহ্মণ, যাঁর কথা তাঁর অধ্যাপক বলেছিলেন।

দক্ষিণেশ্বরের ঐ পূজারী ব্রাহ্মণকে দেখে তার মনে হ'লো—দেখিই না ওঁকে জিজ্ঞেস ক'রে—উনি ভগবান দেখেছেন কি না!

কয়েকদিন পর সত্য সত্যই কয়েকজন বন্ধুকে নিয়ে নরেন্দ্রনাথ



দক্ষিণেশ্বরে গিয়ে হাজির। শ্রীরামকৃষ্ণ তাকে খুব আদর করে বসালেন। তারপর গান গাইতে বললেন। নরেন্দ্রনাথ মনপ্রাণ দিয়ে ব্রাহ্মসমাজে শেখা গান গাইলো—

"মন চল নিজ নিকেতনে।
সংসার বিদেশে বিদেশীর বেশে
ভ্রম কেন অকারণে।
বিষয় পঞ্চক আর ভূতগণ,
সব তোর পর, কেউ নয় আপন,
পরপ্রেমে কেন হইয়ে মগন
ভুলিছ আপন জনে।" —ইত্যাদি।

যাতায়াতের ফলে কেমন একটা টান এই পাগলা বামুণের জন্য নরেন্দ্রনাথের মনে জাগে। একদিন নিজের মনের সংশয় দূর করবার জন্য নরেন্দ্রনাথ শ্রীরামকৃষ্ণকে জিজ্ঞাসা করে, "আচ্ছা, ভগবান কি সত্যই আছেন?"

শ্রীরামকৃষ্ণ উত্তর করলেন—"আছে বই কি।"

—"তাঁকে দেখা যায়?"

"হ্যাঁ—যেমন তোকে দেখছি! এমনি ক'রে তাঁকেও দেখা যায়—।"

অবিশ্বাসী নরেন্দ্রনাথের কাছে শ্রীরামকৃষ্ণ এক নতুন জগতের সন্ধান এনে দিলেন।

নরেন্দ্রনাথের বিদ্যার্থী জীবনের আজ পরম আনন্দের দিন। যে সত্যের জন্য সে এতদিন ঘুরে বেড়াচ্ছিল আজ তার দুয়ারে এসে সে উপস্থিত! আচার্য ব্রজেন্দ্রনাথ শীল নরেন্দ্রনাথের জীবনের এই প্রসঙ্গের উল্লেখ ক'রে বলেছেন—"...অবশেষে সেই ব্যাকুল আত্মার অভিসার একদিন তাকে নিয়ে এলো দক্ষিণেশ্বরে পরমহংসের কাছে। মন তার এখনও সংশয়মুক্ত হয় নি। তিনি এমন প্রত্যয়ের সুরে তার সঙ্গে কথা বললেন যা পূর্বে কেউ বলেনি এবং তাঁর শক্তিদ্বারা তার (নরেন্দ্রনাথের) মনের ক্ষতস্থানগুলি নিরাময় ক'রে দিলেন।"

# বিদ্যার্থী বিবেকানন্দ

আদর্শ গুরু আপন শক্তিদ্বারা শিষ্যের জীবনের বিকাশ ঘটিয়ে থাকেন। শ্রীরামকৃষ্ণ নরেন্দ্রনাথকে নিয়ে একদিন নির্জনে গিয়ে কানে কানে বললেন—"আমি জানি তুই ধ্যানসিদ্ধ মহাপুরুষ—জগতের কল্যাণের জন্য মা তোকে এনেছে।" আরো বলেন—"আমি জানি তুমি নররূপী নারায়ণ।"

নরেন্দ্রনাথ ভাবে এসব পাগলা বামুণের কথা। কিন্তু বক্তৃতার বেড়াজাল এবং বইয়ের পাতা ছাড়িয়ে যে সত্য রয়েছে এই পাগলা বামুণ আজ তাকে সেই সত্যের খবর দিলো। ভগবানকে দেখা যায়। জগতের কল্যাণের জন্য তার আসা। নরেন্দ্রনাথ ভাবে দেখিই না পরীক্ষা করে। অদ্ভুত গুরুর অদ্ভুত শিষ্য!

নরেন্দ্রনাথ তখন এফ. এ. পরীক্ষা দিয়ে বি. এ. ক্লাসে পড়তে থাকে। কিন্তু তার বিদ্যার্থী-জীবনের নতুন পাঠ চলতে থাকে ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের কাছে—ধীরে ধীরে, কিন্তু নিশ্চিত লক্ষ্যের দিকে—। নরেন্দ্রনাথ থেকে বিবেকানন্দ হবার দিকে তার জীবন চললো। যেমন গঙ্গা সমুদ্রের দিকে যায়।

—o—